শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
জীবনী ও শিক্ষা
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী
শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাধন্য
শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী কর্তৃক সম্পাদিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, লস্ এ্যাঞ্জেলেস, প্যারিস

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীশ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ—৪০,০০০ কপি, ১৯৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ—২০,০০০ কপি, ১৯৯০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ—৪০,০০০ কপি, ১৯৯১
চতুর্থ সংস্করণ ঃ—৫০,০০০ কপি, ১৯৯২
পঞ্চম সংস্করণ ঃ—৩০,০০০ কপি, ১৯৯৪
ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ—৩০,০০০ কপি, ১৯৯৬
সপ্তম সংস্করণ ঃ—২০,০০০ কপি, ১৯৯৬
অষ্টম সংস্করণ ঃ—৫০,০০০ কপি, ১৯৯৭

মুদ্রণ ঃ
বৃহৎমৃদঙ্গ ভবন
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা- নদীয়া

ভিক্ষা ঃ ৬ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান বলতে যে কি বোঝায় তা আজ অধিকাংশ মানুষই জানে না। তারা মনে করে যে, মানুষ যদি একটু-আধটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে, তা হলেই সে ভগবান হয়ে যায়। মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বহু প্রবঞ্চক ইদানীং নিজেদের ভগবান বলে জাহির করার চেষ্টা করছে এবং মূর্খ মানুষেরা সেই সমস্ত প্রবঞ্চকদের ভগবান বলে পূজা করে প্রতারিত হচ্ছে।

ভগবান শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

অর্থাৎ, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য — এই ছয়টি অচিন্ত্য শক্তি যাঁর মধ্যে

বিরাজমান, তিনিই ভগবান। তা কেবল সর্বকারণের পরম কারণ পরম ঈশ্বরের মধ্যেই দেখা যায়। জীবের মধ্যে আংশিকভাবে এই গুণগুলির সমাবেশ দেখা গেলেও কখনো পূর্ণরূপে এই ছয়টি গুণের প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই জীব সর্ব অবস্থাতেই জীব এবং ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। জীব কখনো ভগবান হতে পারে না। পক্ষান্তরে, জীবের পক্ষে ভগবান হওয়ার চেষ্টা করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলেই জীব জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাই ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করাই জীবের ভব-বন্ধন বা জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। কিন্তু তা না করে সে যদি ভগবান সাজতে চায়, তা হলে পরিণামে তার যে কি গতি হয়, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

জীবকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করার পথ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান তাঁর স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দ্বাপরের শেষে, এবং তিনি ভগবদ্গীতার মাধ্যমে

সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন। ভগবান নিজে এসে তাঁর ভগবত্তা প্রচার করেছিলেন, কিন্তু কলিযুগের দুর্ভাগা মানুষেরা তাঁর সেই পরম কল্যাণকর বাণী হৃদয়ঙ্গম না করে নিজেরাই ভগবান সাজবার চেষ্টা করে চরম সর্বনাশের পথে পা বাড়াল। তাই পরম করুণাময় ভগবান তাঁর কল্যাণতম রূপ প্রকাশ করে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করলেন। ভগবান যখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে জীবকে শিক্ষা দিলেন, "আমিই ভগবান, আমার শরণাগত হয়ে তোমার জন্ম সার্থক কর," জীব তখন তাঁর সেই কথা শুনে চক্রান্ত করল, "কৃষ্ণ যদি এইভাবে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করতে পারে, তা হলে আমিই বা কেন নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করতে পারব না?" তাই সে তার আসুরিক মনোবৃত্তি (ভগবদ্বিদ্বেষী মনোবৃত্তি) প্রকাশ করে ঘোষণা করল, "আমি ভগবান, তুমি ভগবান, সব কিছুই ভগবান, শুধু কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান নন্।"

এইভাবে ভগবানের অবমাননা করার ফলে তার সর্বনাশ হল। তার দুঃখ-দুর্দশা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেল। তাই ভগবান ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে শিক্ষা দিলেন, "ঐ শ্রীকৃষ্ণই

হচ্ছেন 'একমেব অদ্বিতীয়' পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর শরণাগত হয়ে তোমার জীবন সার্থক কর।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে পরম কল্যাণময় পথ প্রদর্শন করলেন।

ভক্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেও ভগবানের ভগবত্তা অপ্রকাশিত থাকে না। তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের কাছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী পর্যালোচনা করলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তৎকালীন সমস্ত জ্ঞানী, গুণী ও মহামনীষীরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে তাঁদের জীবন সার্থক করেছিলেন।

জনসাধারণকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার মানসে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি হলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আরও ভালভাবে জানবার স্পৃহা জাগবে। তখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী প্রকাশকারী গ্রন্থাবলীর শরণ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী পাঠক সেই অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত হতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম / সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করার জন্য তিনি তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর কৃপায় আজ সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হয়েছে। পৃথিবীর সব কটি দেশের বুদ্ধিমান মানুষেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হয়ে তাঁদের জীবন সার্থক করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবাসী এই পরম কল্যাণময় কার্যে পিছিয়ে রয়েছে। তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ ভারতবর্ষ সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছে। ভগবানকে অবহেলা করার ফলেই ভারতের আজ এই দুর্দশা। কিন্তু ভারতবাসী যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী গ্রহণ করে, তা হলে ভারতবর্ষ আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন সূর্যাস্তের ঠিক পরেই নদীয়া নগরের শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। ইংরেজি বর্ষ অনুযায়ী সেটি ছিল ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। সেই সময় চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তখন নদীয়াবাসীরা উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি সহকারে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর মাতা শচীদেবী ছিলেন একজন আদর্শ রমণী। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত এবং শ্রীহট্ট জেলায় তাঁদের আদি নিবাস ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপম রূপে আকৃষ্ট হয়ে নরনারীরা নানা উপহার নিয়ে তাঁকে দেখতে আসতেন।

তাঁর মাতামহ বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কালক্রমে এই শিশুটি

এক মহাপুরুষে পরিণত হবে। তাই তিনি শিশুটির নামকরণ করেন বিশ্বম্ভর। তাঁর গায়ের রং ছিল কাঁচা সোনার মতো; প্রতিবেশী মহিলারা তাই তাঁকে গৌরহরি বলে ডাকতেন, আর নিমগাছের নিচে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর মা তাঁর নাম দিয়েছিলেন নিমাই। অপরূপ সুন্দর এই শিশুটিকে দুচোখ ভরে দেখার জন্য প্রতিদিনই বহু লোক তাঁদের বাড়িতে আসতেন। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই নিমাইয়ের দুরন্তপনা এবং চঞ্চলতা বাড়তে থাকে। পাঁচ বছর বয়সে নিমাই পাঠশালায় যেতে শুরু করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন অধিকাংশ জীবনীকারই তাঁর শৈশবের সরল ও সহজ, কিন্তু অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে যে, শৈশবে মাতৃক্রোড়ে তিনি অবিরামভাবে ক্রন্দন করতেন এবং প্রতিবেশী মহিলারা 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করলে তিনি ক্রন্দন থেকে বিরত হতেন। এইভাবে অবিরাম গৃহে হরিনাম কীর্তন করিয়ে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি হরিনাম প্রচারের মহানায়ক হবেন।

এক সময়ে তাঁর মায়ের দেওয়া অতি সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করার পরিবর্তে নিমাই মৃত্তিকা ভক্ষণ করেন। তাঁর মা যখন তাঁকে মাটি খাওয়ার জন্য তিরস্কার করেন এবং মাটি খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন নিমাই তাঁকে বলেন যে, সেই মিষ্টিগুলিও হচ্ছে মাটিরই রূপান্তর, তাই মিষ্টি খাওয়া আর মাটি খাওয়া একই কথা। শচীমাতা ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা এবং জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী, তাই তাঁর পাণ্ডিত্যও কিছু কম ছিল না। তিনি নিমাইকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কলসীর আকারে জলের পাত্ররূপে মাটি ব্যবহৃত হয়, আর সেই মাটি যখন ইঁটের রূপ ধারণ করে তখন আর তাকে জলের পাত্ররূপে ব্যবহার করা যায় না। তাই মিষ্টদ্রব্যরূপে মাটি আহার্য হলেও, অন্য অবস্থায় মাটি আহার্য নয়। তাঁর এই যুক্তি শুনে বালক নিমাই মাটি খাওয়ার জন্য তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি এইভাবে মাটি খাবেন না।

আর একটি অলৌকিক লীলার বর্ণনা করা হয়েছে—এক

সময়ে এক তৈর্থীক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। তিনি যখন ভোগ রন্ধন করে ধ্যানে তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছিলেন, তখন শিশু নিমাই সেখানে গিয়ে সেই ভোগ খেতে শুরু করেন। শিশু নিমাইয়ের এই আচরণে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অনুরোধে পুনরায় তিনি রন্ধন করেন এবং আবার যখন তিনি ধ্যানে সেই ভোগ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছিলেন, তখন শিশু নিমাই এসে আবার তা খেয়ে ফেলেন। নিমাইয়ের এই আচরণে সকলেই খুব ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে শাসন করতে উদ্যত হন, এবং সকলের অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করতে সম্মত হন। তখন গভীর রাত্রি, নিমাইকে একটি ঘরে ঘুম পাড়িয়ে তাঁকে ঘিরে সকলেই নিদ্রাভিভূত। সেই গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ। ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বালগোপাল রূপে সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করে আশীর্বাদ করেন। এইভাবে তাঁর ইষ্টদেবকে দর্শন করে ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হন।

এক সময়ে দুটি চোর তাঁকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং পথে তাঁকে মিষ্টি খেতে দেয়। কিন্তু শিশু নিমাই তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা তাদের এমনই মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে ফেলেন যে, সেই চোর দুটি সারা শহর ঘুরে তাদের নিজেদের বাড়িতে এসেছে মনে করে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে এসে নিমাইকে তাদের কাঁধ থেকে নামায়। নিমাই তখন 'বাবা', 'বাবা' বলতে বলতে অদূরে দণ্ডায়মান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের দিকে ছুটে যান এবং বাৎসল্য স্নেহে আপ্লুত হয়ে জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে কোলে তুলে নেন। চোর দুটি তখন বুঝতে পারে যে, ভুল করে তারা সেই শিশুটিকে তার নিজেরই বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে। তখন ধরা পড়ার ভয়ে তারা সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

আর একটি অলৌকিক কাহিনী হচ্ছে যে, একবার একাদশীর দিনে হিরণ্য ও জগদীশ নামক দুজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে ভোগ নিবেদন করেছিলেন, শিশু নিমাই সেই নৈবেদ্য খাওয়ার জন্য আবদার করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মনোবাসনার কথা জানতে পেরে হিরণ্য ও জগদীশ শ্রীকৃষ্ণের

নৈবেদ্য নিয়ে এসে তাঁকে তা দেন এবং মহাপ্রভু তা গ্রহণ করেন।

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির পাশে একটি গর্তে উচ্ছিষ্ট ও অশুচি হাঁড়ি ফেলা হত। সেই স্থানটি ছিল অতি অপবিত্র। গৃহ প্রাঙ্গণের যত কিছু আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট ও অশুচি বস্তু সেই গর্তে নিক্ষেপ করা হত। সেখানে কেউই যেত না। একদিন নিমাই সেই অশুচি স্থানে উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপরে গিয়ে বসেন। শচীমাতা তখন হায় হায় করতে করতে সেখানে ছুটে আসেন এবং নিমাইকে সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু নিমাই তাঁর মাকে বোঝান যে, শ্রীবিষ্ণুর ভোগ রন্ধন করা হয়েছে যে পাত্রে সেই পাত্র কখনই অশুচি হতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা সবই পরম পবিত্র।

তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁকে মায়াপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করা হয়। দু'বছরের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর তিনি বাড়িতে তাঁর পিতা কর্তৃক সংগৃহীত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ নিজে নিজেই পাঠ করতেন। তিনি

স্মৃতিশাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্র নিজে নিজেই পাঠ করেন, এবং বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির তত্ত্বাবধানে পাঠরত তাঁর সমবয়সী বন্ধুদের থেকে অনেক অনেক বেশি পারদর্শিতা অর্জন করেন।

এখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, ছন্দ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। অল্প বয়সের বালক নিমাই তখন তাঁর পিতামাতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাঁদের সেবা করে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করবেন, তার কিছুকাল পরে তাঁর পিতৃদেব এই জগৎ থেকে বিদায় নেন। তাঁর মা তখন অত্যন্ত শোকাভিভূতা হয়ে পড়েন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর স্বাভাবিক সৌম্য মূর্তিতে তাঁর বিধবা মাতাকে সান্ত্বনা দেন।

মহাপ্রভুর বয়স যখন চৌদ্দ বা পনের বছর, তখন তাঁর সঙ্গে নদীয়া নিবাসী বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়। সেই সময়ে তিনি ছিলেন ন্যায়-দর্শন ও সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান নদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। স্মার্ত পণ্ডিতদের কথা দূরে থাক,

নৈয়ায়িকরাও শাস্ত্রালোচনায় তাঁর সম্মুখীন হতে ভয় পেতেন। গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থিত থাকায় ধন উপার্জনের জন্য তিনি পূর্ববঙ্গে গমন করেন। সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রদর্শন করে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। সেই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-তত্ত্ব প্রচার করেন, এবং তপন মিশ্রকে বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে নির্দেশ দেন। পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্প-দর্শনে এই জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর শোকাভিভূতা মাতাকে দর্শন করে তিনি ব্যথিত হন এবং তাঁকে মানব জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

তখন তিনি নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কেশব মিশ্র নামক কাশ্মীরের এক পণ্ডিত নিজেকে দিগ্বিজয়ী বলে পরিচয় দিতেন। বাস্তবিকই তিনি ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদের পরাজিত করেছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিতদের

সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি সেখানে আসেন। তখন সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ভয়ে ভীত হয়ে নদীয়ার সমস্ত টোলের অধ্যাপকেরা বিভিন্ন অজুহাতে নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে যান। মহাপ্রভুর সঙ্গে কেশব পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয় মায়াপুরে, গঙ্গার তীরে বারকোণা নামক ঘাটে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মহাপ্রভু তাঁকে পরাস্ত করেন। এইভাবে নিমাই বালক অবস্থাতেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তাঁর বয়স যখন ষোল বা সতের, তখন তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার জন্য কিছু ছাত্র সহ গয়ায় যান এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর যখন তিনি নদীয়ায় ফিরে আসেন, তখন তিনি ভগবানের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন, এবং সেই সময়ে তাঁর ভগবদ্ভক্তি এত প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ মহান্ বৈষ্ণবেরা পর্যন্ত তাঁর এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তখন তিনি

আর নৈয়ায়িক, তর্কনিষ্ঠ স্মার্ত বা পণ্ডিত নন। তখন কৃষ্ণনাম শুনলেই তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে মূর্ছিত হন, এবং ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমুরারি গুপ্ত বর্ণনা করেন যে, তাঁর শত শত অনুগামীর সম্মুখে, বিশেষ করে যাদের অধিকাংশই ছিলেন বিদ্বান্ ও পণ্ডিত, তাঁদের তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে তাঁর দিব্য ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন।

সেই সময়ে তাঁর নিষ্ঠাবান অনুগামীদের নিয়ে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহাঙ্গনে প্রতিদিন রাত্রে কীর্তনানুষ্ঠান শুরু করেন। সেখানে তিনি ভগবানের বাণী প্রচার করতেন, ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন, ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতেন এবং সব রকম দিব্য ভাবসমূহ প্রদর্শন করতেন। সেই সময়ে সারা ভারত পর্যটন করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে তখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত একনিষ্ঠ বৈষ্ণব প্রচারকেরা সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এইভাবে নদীয়া তখন বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দ ও সাধু-

মহাত্মাদের এক পীঠস্থানে পরিণত হয়। মানব-সমাজকে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই সমস্ত বেদজ্ঞ মহাজনে নদীয়া তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তাঁর অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে তিনি প্রথমে আদেশ দেন —

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা'॥"

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে সেই দুই প্রচারক যখন প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে জগাই ও মাধাই নামক দুজন অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোকের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা যখন তাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই নির্দেশের কথা বলেন, তখন জগাই ও মাধাই অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাঁদের অপমান করে এবং একটি ভাঙা কলসীর কানা দিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করে। সেই সংবাদ পাওয়ামাত্র সংহারমূর্তি ধারণ করে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু সেখানে আবির্ভূত হন এবং সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন এই দুই পাপিষ্ঠকে সংহার করার জন্য। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরস্ত হন এবং তাঁর কৃপায় তারা পাষণ্ডী থেকে মহাভাগবতে পরিণত হয়।

নিমাই পণ্ডিতের এই অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করে সমস্ত নদীয়াবাসী অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁরা বলতে থাকেন, "নিমাই পণ্ডিত কেবল এক প্রতিভাশালী পণ্ডিতই নন, তিনি ভগবদ্বাণীর এক মহান্ প্রচারকও।" সেই সময় থেকে তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল নবদ্বীপেই নয়, পার্শ্ববর্তী সমস্ত নগর ও গ্রামে তাঁর বাণী প্রচার করেন। তাঁর অনুগামীদের গৃহে তিনি অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন, ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য শিক্ষা দেন এবং ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন করেন। হাটে-ঘাটে সর্বত্রই তাঁর অনুগামীরা নাম-সংকীর্তন করতে শুরু করেন। তার ফলে এক অপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন মানুষের হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়। ভক্তরা উৎফুল্ল হন। স্মার্ত আর জাতি-ব্রাহ্মণেরা নিমাই পণ্ডিতের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হন এবং নিমাই

পণ্ডিতের এই আচরণ অহিন্দু বলে স্থানীয় কাজীর কাছে অভিযোগ করেন। কাজী তখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে একটি মৃদঙ্গ ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা যদি এই গণ্ডগোল বন্ধ না করে, তা হলে তিনি জোর করে তাঁদের ধর্মান্তরিত করবেন।

সেই সংবাদ যখন মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর সমস্ত অনুগামীরা যেন মশাল হাতে সন্ধ্যাবেলায় সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাঁর আহ্বানে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল এবং চৌদ্দটি দলে তাঁদের বিভক্ত করে এক মহাসংকীর্তন সহকারে তিনি চাঁদকাজীর গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে চাঁদকাজীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং তাঁর অলৌকিক প্রভাবে চাঁদকাজী বৈষ্ণবে পরিণত হন। কাজী তখন ক্রন্দন করতে করতে তাকে জানান যে, তাঁর হৃদয়ে তিনি এক অপূর্ব দিব্য প্রভাব অনুভব করছেন, যার ফলে তাঁর মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে এবং ভগবদ্ভক্তির আবেগে তিনি পরম আনন্দে মগ্ন হয়েছেন। কাজীও তখন মহাপ্রভুর সংকীর্তনে যোগদান করেন।

মহাপ্রভুর এই অলৌকিক প্রভাব দর্শন করে সমস্ত জগৎ তখন বিস্মিত হয়েছিল এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে বিরোধী শত শত মানুষ বিশ্বম্ভরের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল।

তার কিছুদিন পর কুলিয়ায় ঈর্ষাপরায়ণ এবং সংকীর্ণমনা কিছু ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দল সংগঠিত করে। নিমাই পণ্ডিতের হৃদয় ছিল স্বাভাবিকভাবে কোমল, যদিও তাঁর সংকল্প ছিল অত্যন্ত বৃহৎ। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে, দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা — এই দুটি প্রগতির পথে এক বিষম অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন যে, যতদিন নদীয়াবাসীরূপে তিনি কোন বিশেষ পরিবারভুক্ত থাকবেন, ততদিন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। তিনি তখন কোন এক বিশেষ পরিবার, গোত্র এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত না থেকে সারা বিশ্বের আপনজন হওয়ার সংকল্প করেন; এবং সেই সংকল্প অনুসারে তিনি চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁর মাতা এবং পত্নী আকুলভাবে ক্রন্দন করেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু কোমল হৃদয় হলেও তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি তাঁর গৃহের ক্ষুদ্র জগতটি পরিত্যাগ করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সারা বিশ্বের সমস্ত জীবদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তহীন চিন্ময় জগতে প্রবেশ করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে পথ ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে নিয়ে আসেন। শচীমাতা সহ নদীয়ায় তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও সখাদের অদ্বৈত প্রভু আমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেন। সন্ন্যাসীর বেশধারী পুত্রকে দর্শন করে শচীমাতাব হৃদয় হর্ষ ও বিষাদে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরণে ছিল কৌপীন এবং বহির্বাস, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত আর হাতে তাঁর দণ্ড ও কমণ্ডলু।

মহান্ পুত্র তাঁর প্রেমময়ী জননীর পদতলে পতিত হয়ে বললেন, "মা। এই দেহ তোমার, আমি নিশ্চয় তোমার আদেশ পালন করব। পরমার্থ সাধনের জন্য তুমি আমাকে বৃন্দাবন যাওয়ার অনুমতি দাও।" অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শচীমাতা তাঁকে জগন্নাথপুরীতে থাকতে

বলেন, যাতে মাঝে মাঝে তাঁর সংবাদ পেতে পারেন। এই প্রস্তাবে মহাপ্রভু রাজী হন এবং তার কয়েকদিন পরে তিনি শান্তিপুর থেকে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন।

মহাপ্রভুর জীবনীকারেরা শান্তিপুর থেকে তাঁর পুরী যাত্রা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার পাড় ধরে তিনি ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারের মথুরা থানায় অন্তর্ভুক্ত ছত্রভোগ পর্যন্ত যান। সেখান থেকে তিনি একটি নৌকা করে মেদিনীপুর জেলার প্রয়াগ ঘাট পর্যন্ত যান, তারপর পায়ে হেঁটে বালেশ্বর এবং কটক হয়ে পুরী গমন করেন। পুরীতে পৌঁছে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে তাঁর গৃহে অবস্থান করেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন সেই সময়কার এক মহান পণ্ডিত। তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। তিনি ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-ভাষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর জন্ম হয় নদীয়ার বিদ্যানগরে এবং তাঁর টোলে তিনি অসংখ্য ছাত্রকে ন্যায়-দর্শনের সুশিক্ষা দান করেন। নিমাই পণ্ডিতের জন্মের

পূর্বেই তিনি নদীয়া থেকে পুরীতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর শ্যালক গোপীনাথ আচার্য তাঁকে এই নবীন সন্ন্যাসীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপে মুগ্ধচিত্ত সার্বভৌম এই নবীন সন্ন্যাসীটির পক্ষে তার দীর্ঘ জীবন পথে সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না সে সম্বন্ধে সংশয়বোধ করেছিলেন। গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ থেকেই জানতেন। তাঁর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জানান যে, এই নবীন সন্ন্যাসীটি কোন সাধারণ মানুষ নন। এই বিষয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে গোপীনাথ আচার্যের তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হয়। তারপর সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং মহাপ্রভু অত্যন্ত বিনীতভাবে তাতে সম্মতি জানান।

মহাপ্রভু নিঃশব্দে সাতদিন ধরে বৈদান্তিক সার্বভৌমের গভীর বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। অবশেষে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আমার মনে হয় তুমি বেদান্ত-সূত্র বুঝতে পারছ না, কারণ আমার বেদান্ত পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুনে

তুমি কিছুই বলছ না।" তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দেন যে, তিনি ভালভাবেই বেদান্ত-সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য যে তাঁর ভাষ্যে কি বলেছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে সার্বভৌম বলেন, "তুমি সূত্রের অর্থ বুঝতে পারছ, অথচ সূত্রের অর্থ বিশ্লেষণকারীর ভাষ্য বুঝতে পারছ না, তা কি করে সম্ভব? বেশ, তুমি যদি সূত্রগুলি বুঝে থাক তা হলে তার অর্থ বিশ্লেষণ কর।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষবাদ সমন্বিত ভাষ্য স্পর্শ না করেই বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুক্তির সত্যতা সৌন্দর্য এবং সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এই প্রথম তিনি বেদান্ত-সূত্রের এত সরল ব্যাখ্যা শুনলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করলেন, শঙ্করাচার্যের ভাষ্য কখনও এমন সরল এবং স্বাভাবিকভাবে তা বিশ্লেষণ করতে পারেনি। তিনি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর

সমর্থক এবং অনুগামী হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হন। সে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা উড়িষ্যা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে। শত শত লোক তাঁর অনুগামী হন। কিছুদিন পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সংকল্প করেন এবং কৃষ্ণদাস নামক নিত্যানন্দ প্রভুর এক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

তাঁর জীবনীকারেরা তাঁর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি কূর্মক্ষেত্র নামক স্থানে যান। সেখানে তিনি বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করেন। গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরের রাজ্যপাল শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং তাঁরা প্রেমভক্তি প্রসঙ্গে অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব আলোচনা করেন। দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র যে সপ্ততালবৃক্ষের আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে বালীকে বধ করেছিলেন, তাঁর করকমলের স্পর্শের দ্বারা তিনি সেই সপ্ততালবৃক্ষ উদ্ধার করেন (অর্থাৎ, তারা তৎক্ষণাৎ এই জগৎ থেকে অন্তর্হিত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যায়)।

এই যাত্রাপথে তিনি বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। বর্ষার চার মাস তিনি রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেন এবং সেখানে ব্যেঙ্কট ভট্টের দশ বছর বয়স্ক পুত্র গোপাল সহ তাঁর পরিবারের সকলকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেন। ব্যেঙ্কট ভট্টের এই পুত্রই হচ্ছেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। তাঁর পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করে গোপাল ভট্ট বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অসংখ্য তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডারপুর হয়ে দুবছর পর পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পাণ্ডারপুরে তিনি তুকারাম নামক এক ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে তুকারাম একজন মহান্ প্রচারকে পরিণত হন। সে কথা তিনি তাঁর আভাসে বর্ণনা করেছেন। বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় তা সংগৃহীত হয়েছে। এই ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ,

জৈন ও মায়াবাদীদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন করার পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণসহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল সাতাশ বছর। তাঁর বয়স যখন আঠাশ বছর, তখন তিনি মালদহের গৌড় পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রূপ এবং সনাতন নামক দুই মহান্ পুরুষকে কৃপা করেন। যদিও তাঁরা ছিলেন কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত, তথাপি তৎকালীন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁরা জাতিচ্যুত হয়ে প্রায় মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন। নবাব হুসেন শাহ তাঁদের দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তাঁদের পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা এবং রাজকার্যে অদ্ভুত পারদর্শিতার জন্য উভয়ে গৌড়াধিপতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। হিন্দু সমাজে ফিরে যাওয়ার কোন পথ না পেয়ে তাঁরা পারমার্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পত্র

এই যাত্রাপথে তিনি বৈষ্ণব-তত্ত্ব ও হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। বর্ষার চার মাস তিনি রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেন এবং সেখানে ব্যেঙ্কট ভট্টের দশ বছর বয়স্ক পুত্র গোপাল সহ তাঁর পরিবারের সকলকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেন। ব্যেঙ্কট ভট্টের এই পুত্রই হচ্ছেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী। তাঁর পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করে গোপাল ভট্ট বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অসংখ্য তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডারপুর হয়ে দুবছর পর পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পাণ্ডারপুরে তিনি তুকারাম নামক এক ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে তুকারাম একজন মহান্ প্রচারকে পরিণত হন। সে কথা তিনি তাঁর আভাসে বর্ণনা করেছেন। বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় তা সংগৃহীত হয়েছে। এই ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ,

জৈন ও মায়াবাদীদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন করার পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণসহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল সাতাশ বছর। তাঁর বয়স যখন আঠাশ বছর, তখন তিনি মালদহের গৌড় পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রূপ এবং সনাতন নামক দুই মহান্ পুরুষকে কৃপা করেন। যদিও তাঁরা ছিলেন কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, তথাপি তৎকালীন গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁরা জাতিচ্যুত হয়ে প্রায় মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন। নবাব হুসেন শাহ তাঁদের দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং তাঁদের পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা এবং রাজকার্যে অদ্ভুত পারদর্শিতার জন্য উভয়ে গৌড়াধিপতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। হিন্দু সমাজে ফিরে যাওয়ার কোন পথ না পেয়ে তাঁরা পারমার্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পত্র

প্রেরণ করেছিলেন। পত্রের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে যাবেন এবং ধর্মীয় এই সংকট থেকে তাঁদের উদ্ধার করবেন। তাই মহাপ্রভু যখন গৌড়ে এলেন তখন দুই ভাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বহু প্রতীক্ষিত প্রার্থনা নিবেদন করলেন। মহাপ্রভু তাঁদের বৃন্দাবনে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, সেখানে তাঁর সঙ্গে আবার তাঁদের মিলন হবে।

পুরী যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে যান, সেখানে আবার তাঁর মায়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পুরীতে কিছুদিন থাকার পর তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য এবং একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য। বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে প্রত্যাবর্তনের সময়ে কোরানের ভিত্তিতে তিনি বহু মুসলমানকে বৈষ্ণবে পরিণত করেন। তাদের বংশধরেরা আজও পাঠান বৈষ্ণব নামে পরিচিত।

প্রয়াগে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং দশ দিন ধরে তিনি তাঁকে পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং

বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করে তাঁকে তিনি বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবৎ-প্রেম বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করতে এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে নির্দেশ দেন, যাতে সমগ্র জগতের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়। রূপ গোস্বামী প্রয়াগ ত্যাগ করে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে অবস্থান করেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এইখানে সনাতন গোস্বামী তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন এবং পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে দুমাস ধরে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীকারেরা, বিশেষ করে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনা করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সমকালীন নন, তবে তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীদের কাছ থেকে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীব গোস্বামী ষট্‌-সন্দর্ভ নামক এক অমূল্য গ্রন্থাবলী আমাদের দান করেন গেছেন। এই গ্রন্থে তিনি মহাপ্রভুর তত্ত্ব দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা এই সমস্ত মহান্ ভগবৎ-পার্ষদ্‌দেব গ্রন্থ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সংগ্রহ করে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করেছি।

বারাণসীতে অবস্থানকালে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে সেই শহরের সমস্ত মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। সেই আলোচনার প্রাক্কালে এক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত সন্ন্যাসীদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার হয়। সেই সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব করেছিলেন মহাজ্ঞানী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। স্বল্পকাল বিতর্কের পর তাঁরা মহাপ্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং বলেন শঙ্করভাষ্যের দ্বারা তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন।

মহাপণ্ডিতদের পক্ষেও দীর্ঘকাল ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

বিরোধিতা করা সম্ভব হত না; যেন এক অদ্ভুত জাদুর প্রভাবে তাঁদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং ভগবদ্ভাবনায় আকুল হয়ে তাঁরা ক্রন্দন করতেন। অচিরেই বারাণসীর সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁদের শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের সঞ্চার করেন, যার ফলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এই রকম অদ্ভুতভাবে বৈষ্ণবে পরিণত করতে দেখে সারা বারাণসী তাদের নবীন প্রভুটিকে নিয়ে এক মহাসংকীর্তন করেন।

সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠাবার পর মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডের বনপথে বলভদ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য বর্ণনা করেন, সেই বনপথে মহাপ্রভু কিরকম সমস্ত অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণনামে অনুপ্রাণিত করে তিনি বনের হিংস্র পশুদেরও ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়েছিলেন এবং ভগবৎ-প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়েছিলেন।

সেই সময় থেকে, অর্থাৎ তাঁর একত্রিশ বছর থেকে আটচল্লিশ

বছর বয়সে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে সংকীর্তন করতে করতে তাঁর লীলা সংবরণ করা পর্যন্ত তিনি পুরীতে কাশী মিশ্রের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। এই আঠার বছরে তাঁর জীবন ছিল কৃষ্ণ-বিরহে আকুল শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত প্রকাশ। এই সময়ে তিনি অসংখ্য ভগবদ্ভক্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। তাঁদের নির্মল চরিত্র, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর ধর্মনিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল তাঁদের অসাধারণ বৈষ্ণবতার লক্ষণ।

স্বরূপ দামোদর, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপে অবস্থানকালে পুরুষোত্তম আচার্য নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি বারাণসীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সচিবরূপে তাঁর সেবা করতে শুরু করেন। কোন কবি বা দার্শনিকের রচনা স্বরূপ দামোদরের স্বীকৃতি ব্যতীত মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত করা হত না। কারণ স্বরূপ দামোদর সেগুলির শুদ্ধতা এবং তাৎপর্য বিচার করে তবে তার স্বীকৃতি দিতেন। রায় রামানন্দ ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভগবৎ-বিরহে বিশেষ কোন ভাব ব্যক্ত করতেন, তখন সেই অনুসারে

রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে গাইতেন। পরমানন্দ পুরী ছিলেন তাঁর ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা। বিভিন্ন জীবনীকারেরা তাঁর শত শত অদ্ভুত লীলা বর্ণনা করেছেন, যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব অল্প সময়ের জন্য নিদ্রা যেতেন। তাঁর অন্তরের ভগবৎ-প্রেম রাত্রি-দিনে তাঁকে অপ্রাকৃত জগতের সুদূর প্রদেশে নিয়ে যেত, এবং গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাঁর ঐ সমস্ত অতি অদ্ভুত লীলা দর্শন করতেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের ভজনা করতেন। বৃন্দাবনের প্রচারকদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন এবং যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করতেন। নিত্য কীর্তনে তিনি আবিষ্ট থাকতেন এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধেও তাঁর কোন রকম যত্ন ছিল না। প্রায়ই তিনি ভগবানের মাধুর্যে মগ্ন হয়ে আত্মহারা হয়ে থাকতেন। যাঁরাই তাঁর কাছে আসতেন, তাঁরাই বুঝতে পারতেন যে, তিনি হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্য সমন্বিত স্বয়ং ভগবান, জীবরূপে করুণা করার জন্য তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর মাতৃভক্তি চিরকাল অটুট ছিল এবং কেউ যখন নবদ্বীপ

যেতেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে তাঁর জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রকাশ। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তাঁরাই তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত রূপে মুগ্ধ হতেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর উপর বঙ্গভূমিতে প্রচারের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ছয়জন গোস্বামীকে তিনি ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তাঁর যে সমস্ত শিষ্য ভগবদ্ভক্তির পবিত্র মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের কঠোরভাবে শাসন করেছিলেন। তাঁর এই দণ্ডদান লীলা বিশেভাবে ছোট হরিদাসের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল।

তাঁর নির্দেশ অনুসারে যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং ভগবানের বাণী প্রচার করেছিলেন, তাঁদের যথাযথ উপদেশ দানে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয় রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রতি তাঁর শিক্ষায়। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাঁর আচরণ থেকে বোঝা যায় যথার্থ ভগবদ্ভক্ত তাঁর কত প্রিয় ছিল। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা উপেক্ষা করে তিনি পারমার্থিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

শ্রীসনাতন শিক্ষা

বাংলার নবাব হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী সাকর মল্লিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজমন্ত্রীর পদ হেলাভরে পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কাশীতে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেছিলেন —

"'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।
ইহা নাহি জানি— 'কেমনে হিত হয়'॥
'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১০২-১০৩)

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "সনাতন! শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তুমি পূর্ণরূপে লাভ করেছ। তুমি সব তত্ত্ব জান, তোমার

তাপত্রয় নেই। তবুও দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করার জন্য তুমি আমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ।" এই বলে মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে তাঁর কাছে জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন —

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১০৮)

অর্থাৎ, জীব তার স্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। ভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অন্তবর্তী তটস্থা জীবশক্তি। এই তটস্থা শক্তি জীব তার ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের অন্তরঙ্গা অথবা বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করতে পারে। ভগবানের সঙ্গে কোন অংশে তার অভেদ এবং কোন অংশে ভেদ দৃষ্ট হয়। সেই জন্য মহাপ্রভু বললেন—'ভেদাভেদ প্রকাশ'। সূর্যের কিরণ-কণা যেমন তেজরূপে সূর্য থেকে অভিন্ন, জীবও তেমন গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু আয়তনগতভাবে ভগবান থেকে ভিন্ন। এই সরল বিশ্লেষণের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীমধ্বাচার্যের

ভেদবাদ নিমিত্ত বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের যে বিরোধ, তার সমাধান করে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীব কৃষ্ণবিমুখ হয়ে পড়ার ফলে এই জড় জগতে অধঃপতিত হয় এবং মায়ার প্রভাবে সংসার-দুঃখ ভোগ করে। কখনো সে তার পুণ্য কর্মের প্রভাবে স্বর্গে উন্নীত হয়ে সুখ ভোগ করে, আবার কখনও তার পাপ কর্মের প্রভাবে নরকে অধঃপতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় যদি কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়, তা হলে সে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিস্তার লাভ করে। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। অথচ কৃষ্ণকে না জানলে, কৃষ্ণ উন্মুখ না হলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ জীবকে কৃপা করে বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্র দান করলেন, যাতে তারা তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

বেদশাস্ত্রে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে, তাতে 'সম্বন্ধ' অর্থে প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকতা বোঝায়; অর্থাৎ

প্রতিপাদ্য 'কৃষ্ণ' এবং কৃষ্ণের প্রতিপাদক 'বেদ'। 'অভিধেয়' অর্থে সগুণাদি সাধনভক্তিকে বোঝায়। এই সাধনভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। 'প্রয়োজন' হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — এই চতুর্বর্গের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ হচ্ছে এই প্রেম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেন। একজন সর্বজ্ঞ এসে এক দরিদ্র গৃহস্থকে বললেন, "তোমার এত দুঃখ কেন? তোমার পিতার বহু ধন আছে, তবে তিনি মৃত্যুকালে তোমাকে সে কথা বলে যেতে পারেন নি।" দরিদ্র তখন সর্বজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই ধন কোথায় আছে?" তখন সর্বজ্ঞ বললেন, "দক্ষিণ দিকে মাটি খুঁড়ো না, সেদিকে ভীমরুল আছে; পশ্চিমদিকে খুঁড়ো না, সেখানে যক্ষ আছে, উত্তরদিকেও খুঁড়ো না, সেখানে কৃষ্ণসর্প আছে। পূর্বদিকে খুঁড়লে ধন পাবে।" এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন যে, ধন যেমন সর্বজ্ঞের নির্দেশ মতো পাওয়া যায়, তেমনই সাধু উপদেষ্টার উপদেশ মতো ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে ভগবানকে পাওয়া যায়।

এইভাবে তিনি বোঝালেন যে, জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তির

একমাত্র উপায় ভক্তি। যেমন ধনলাভের ফলে সুখ লাভ হয়, তেমনই ভক্তিলাভের ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। প্রেম-ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করলে জীবের ভবভয় নাশ হয় এবং সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয়। জীবের পক্ষে প্রেমানন্দ ভোগই মুখ্য প্রয়োজন। ভবভয় নাশ আদি আনুষঙ্গিক ফল; বেদ আদি সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান হলে জীবের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব; তিনি স্বয়ং সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, তিনি সমস্ত অবতারের অবতারী, সমস্ত রসের আধার, সর্বচিত্ত আকর্ষক, পীতাম্বরধারী, বনমালী, অপ্রাকৃত নবীন মদন, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় এবং সর্বকারণের পরম কারণ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই একমাত্র পতি, অনন্ত বৈকুণ্ঠের তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, অনন্ত অবতারের তিনি একমাত্র অবতারী। তিনি কিশোর-শেখর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পুরাণ-পুরুষ। তিনি সকলেরই চিত্তাকর্ষক, এমন কি তিনি স্বয়ং তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আকৃষ্ট। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং

ভগবান এবং অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। এই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বকে তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা কেউ ব্রহ্ম, কেউ পরমাত্মা আবার কেউ ভগবান বলে উল্লেখ করেন। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি সাধন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সাধকদের কাছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে প্রকাশিত হন।

সূর্যের যদিও হস্ত-পদ সমন্বিত বিশিষ্ট রূপ রয়েছে, তবুও মানুষের চর্মচক্ষে সেই সূর্যদেব নির্বিশেষ জ্যোতিঃমণ্ডলরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু দেবতাদের দিব্যচক্ষে সূর্যদেবের সবিশেষ রূপ প্রকাশ হয়। তেমনই জ্ঞানমার্গে বিচরণশীল ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু ভক্তের ভক্তিচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। আকাশস্থ এক সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়ে অনন্তরূপে প্রকাশ পান, তেমনই তাঁর নিত্যধামে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জীবে পরমাত্মারূপে প্রতীয়মান হন।

ভক্তরাই কেবল ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ অনুভব করতে পারেন। তাঁরা এক শ্রীবিগ্রহতেই ভগবানের অনন্ত স্বরূপ দেখতে পান।

অনন্ত রূপের মধ্যে তিনটি রূপ শ্রেষ্ঠ। সেই তিনটি রূপ হচ্ছে স্বয়ং রূপ, তদেকাত্ম রূপ এবং আবেশ রূপ। যে রূপ অন্য কারো অপেক্ষা করে না বা অন্য থেকে ব্যক্ত হয় না, সেই আনন্দঘন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং রূপ। স্বয়ং রূপের সঙ্গে অভিন্ন স্বরূপে বিরাজমান, কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন বলে প্রতিভাত হন, তাকে বলা হয় তদেকাত্ম রূপ। স্বাংশ ও বিলাস ভেদে দ্বিবিধ। যে সমস্ত জীবে ভগবান জ্ঞান, শক্তি আদি অংশের দ্বারা আবিষ্ট হন, সেই সমস্ত মহত্তম জীবকে 'আবেশ' বলা হয়।

ভগবানের স্বয়ং রূপ দুইভাবে প্রকাশ হয়। যথা— 'প্রাভব' এবং 'বৈভব'। প্রাভব-বিলাসে এক কৃষ্ণ রাসে অসংখ্য গোপীর সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন এবং ষোলহাজার মহিষীকে বিবাহ করে এক দেহে একসঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। বৈভব বিলাসে একই বিগ্রহ ভিন্নরূপে প্রকাশ হয়। শ্রীবলরাম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। তাঁর বর্ণমাত্র ভেদ, কিন্তু আর সবই শ্রীকৃষ্ণের সমান। দেবকীনন্দন বাসুদেব হচ্ছেন বৈভব প্রকাশ। তিনি কখনও দ্বিভুজ, আবার কখনও চতুর্ভুজ। যখন

তিনি দ্বিভুজ, তখন সেটি তাঁর বৈভব প্রকাশ। আর যখন তিনি চতুর্ভুজ হন তখন তা প্রাভব বিলাস।

স্বয়ং রূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান; বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান, ব্রজেন্দ্রনন্দনের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও বৈদগ্ধের মাধুরী বাসুদেবকে পর্যন্ত আস্বাদন করাতে সতৃষ্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ থেকে পৃথক রূপের নাম তদেকাত্ম রূপ। তা আবার দ্বিবিধরূপে প্রকাশিত। যথা, বিলাস ও স্বাংশ। এই বিলাস রূপ নানারূপে বিভক্ত। তার মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ প্রধান। তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ বলা হয়। বাসুদেব চিত্ত-তত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন কাম-তত্ত্ব এবং অনিরুদ্ধ লীলা-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের এই চারটি প্রাভব-বিলাস মূর্তি। দ্বারকা এবং মথুরায় তাঁদের বাস। এই চারটি প্রাভব-বিলাস মূর্তি থেকে পুনরায় চতুর্বিংশ মূর্তি প্রকাশ পান। অস্ত্র ভেদে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব আদি চতুর্ব্যূহ নিয়ে পুনরায় নানা রূপে পরব্যোমে অধিষ্ঠান করেন। চতুর্ব্যূহের

প্রত্যেকে তিনটি করে মূর্তি প্রকাশ করেন। যথা, বাসুদেবের বিলাস-মূর্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব। সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন। এই গোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন নন। প্রদ্যুম্নের বিলাস-মূর্তি হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। এঁরাই দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দেবতা। শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্ব্যূহের আবার আটজন বিলাস-মূর্তি আছেন। বাসুদেবের অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্তি নৃসিংহ ও জনার্দন এবং অনিরুদ্ধের বিলাস-মূর্তি হরি ও কৃষ্ণ। এই যে চতুর্বিংশ প্রকাশ শ্রীমূর্তি, এঁরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-বিলাসের প্রধান মূর্তি।

কৃষ্ণলোক ত্রিবিধ—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা।

স্বাংশ-বিলাসে ভগবানের স্বরূপ অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন। তার মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তর অবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার এই ছয় প্রকার প্রধান। মহাসমুদ্র থেকে যেমন কোটি কোটি ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়ে নদী নামে অভিহিত হন, তেমনই সপ্তনিধি শ্রীভগবান থেকে অসংখ্য অবতার জগতে অবতীর্ণ হন।

পুরুষাবতার তিনটি—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু।

ভগবানের লীলা-অবতার অসংখ্য। তাঁরা হলেন মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস ইত্যাদি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিন জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। তাঁরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে চৈতন্য দান করে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করেন।

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর হয়। এক এক মন্বন্তরে ভগবান অবতরণ করেন। ব্রহ্মার আয়ু ব্রাহ্মক পরিমাণে শতবর্ষ, সুতরাং ব্রহ্মার জীবনকালে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার মন্বন্তর হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চার যুগে ভগবান ক্রমান্বয়ে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণের মূর্তি পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হন।

তারপর মহাপ্রভু কলিযুগের মহিমা কীর্তন করে বললেন—

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥

শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগে যুগাবতারের বর্ণ পীত। তিনি সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রচারক। এই বর্ণনা থেকে তিনি

তিনি সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রচারক। এই বর্ণনা থেকে তিনি যুগাবতার রূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে চিনতে পারলেন। তাই তিনি পরম চতুরতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—

"অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?" ॥

তার উত্তরে মহাপ্রভু মধুর হেসে বললেন—

"অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র-বাক্যে মানি ॥
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'পরমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান'॥
অবতার নাহি কহে — 'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/৩৫১-৩৫৪)

সনাতন তখন মহাপ্রভুর চরণে করজোড়ে নিবেদন করলেন—

"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য—প্রেমদান-সংকীর্তন ॥

কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০/৩৬৪-৩৬৫)

কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরসুন্দর চতুর চূড়ামণি। কিন্তু তাঁর ভক্তরাও বড় চতুর। তাঁর ভক্তরা তাঁকে প্রকাশ করতে সর্বদাই যত্নবান। আর তিনি প্রকাশ হতে একেবারেই নারাজ। তাই মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে সনাতনকে বললেন—

"প্রভু কহে,—চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২০/৩৬৬)

শ্রীসনাতন আর কোন কথা বলতে পারলেন না। মহাপ্রভু তখন তাঁকে শক্ত্যাবেশ অবতারের কথা বলতে লাগলেন। শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য হলেও গৌণ ও মুখ্য ভেদে দুই প্রকার। যখন যাতে ভগবানের কোন বিশেষ শক্তির প্রকাশ হয়, তখন তাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমন, মনুতে জ্ঞান, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালন, পরশুরামে দুষ্টদমন ইত্যাদি।

তারপর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বয়োঃধর্ম এবং নানা রহস্যের কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে একশ' পঁচিশ বৎসর কাল মৌসলান্ত লীলা পর্যন্ত প্রকটিত হয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়ে ক্ষণান্তে দ্বিতীয় ক্ষণ আরম্ভ হলে প্রথম ক্ষণ সম্বন্ধে লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হয়ে অপ্রকটিত হচ্ছে।

তারপর তিনি বললেন, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তাঁর সর্ব ঐশ্বর্য প্রকাশ করে পূর্ণতম, মথুরা ও দ্বারকায় তিনি পূর্ণতর, এবং বৈকুণ্ঠে তিনি পূর্ণ।

অনন্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, মাধুর্যেরও অবধি নেই, অনন্ত লীলারও অন্ত নেই, লীলাধামেরও সংখ্যা নেই। ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি তাঁর অন্ত খুঁজে পায় না। ব্রহ্মাদির কি কথা, সহস্র বদন অনন্তদেব নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তন করেও তাঁর গুণের অন্ত পান না।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম তিনটি। মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবন তাঁর অন্তঃপুরস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁর নিত্য স্থিতি। পিতামাতা ও বন্ধুদের নিয়ে তিনি এখানে মাধুর্যলীলা সম্পাদন করেন। তার নীচে পরব্যোম বিষ্ণুলোক। তা তাঁর বিলাস-মূর্তি নারায়ণের ধাম। এই ধামে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শয্যায় নারায়ণ মূর্তিতে লক্ষ্মী সহ বিরাজ করেন। তার নীচে মহেশ ধাম ও বিরজার পাড়ে দেবীধাম। সমস্ত বদ্ধজীবেরা সেখানে বাস করে এবং জগলক্ষ্মী তা পালন করেন। ভগবানের চিজ্জগৎ ত্রিপাদ বিভূতিসম্পন্ন এবং জড় জগৎ বা দেবীধাম একপাদ বিভূতিসম্পন্ন। ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের একপাদ বিভূতির ঐশ্বর্য বর্ণনা করে বললেন— একদিন ব্রহ্মা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলেন। সে কথা যখন দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ ব্রহ্মা?" দ্বারী ফিরে এসে ব্রহ্মাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ব্রহ্মা বিস্মিত হেসে দ্বারীকে বললেন যে, তিনি হচ্ছেন সনক-পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা। শ্রীকৃষ্ণকে সে কথা জানিয়ে দ্বারী যখন ব্রহ্মাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন

করে ব্রহ্মা তাঁর সংশয় নিরসন করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি ছাড়া জগতে আর কোন ব্রহ্মা রয়েছে?" ব্রহ্মার সেই কথা শুনে কৃষ্ণ তখন ধ্যান করলেন এবং তৎক্ষণাৎ অসংখ্য ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের কারো দশটি মুখ, কারো বিশটি মুখ, কারো একশটি মুখ, কারো বা আবার এক হাজার মুখ। এইভাবে অযুত, লক্ষ, কোটি, অর্বুদ মুখসম্পন্ন ব্রহ্মারা সেখানে এলেন। লক্ষ-কোটি বদন সমন্বিত রুদ্ররা এলেন। লক্ষ কোটি নয়নসম্পন্ন ইন্দ্ররা এলেন। তা দেখে ব্রহ্মা মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন অসংখ্য হাতিদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মশার মত।

ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে করতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হল। ভগবানের মাধুর্যে তাঁর হৃদয় আপ্লুত হল। তিনি তখন সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে নর-লীলা; সেই লীলায় তাঁর গোপবেশ, হাতে বংশী, নবকিশোর নটবর। সে রূপের এক কণা ত্রিভুবন প্লাবিত করে সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করে।

শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য রূপের এমনই চমৎকারিতা যে তা স্বয়ং

কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপাদন করে এবং তা আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণেরই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ এমনই মনোহর যে তা প্রাকৃত জগতের সমস্ত প্রাণী ও দেবতাদের কি কথা, ব্রহ্মাণ্ডের উপরে পরব্যোমের নারায়ণাদি কৃষ্ণ স্বরূপদেরও মন বলপূর্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র পতিব্রতা শিরোমণি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরাও কৃষ্ণসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম অভিলাষ করেন।

তিনি তাঁর সখাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গোচারণ করেন। তাঁর বংশীধ্বনি শুনে স্থাবর, জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণী পুলকিত হয়, কম্পিত হয় এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

কৃষ্ণের গলদেশে যে মুক্তার হার আছে, তা শুভ্র বকশ্রেণীর মতো, কৃষ্ণের শিরোদেশে যে ময়ূরপাখা আছে, তা ইন্দ্রধনুর মতো এবং তাঁর পীতবসন বিদ্যুতের মতো। কৃষ্ণ যেন নবমেঘ সদৃশ, গোপিকারা যেন জগতের শস্যরাশি সদৃশ। সেই শস্যনিচয়ের উপর মেঘের বারি-বর্ষণের মতো কৃষ্ণ তাঁর লীলামৃতধারা বর্ষণ করে গোপিকাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করেন।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের ভগবত্তার সার হচ্ছে মাধুর্য। সেই

মাধুর্য কেবল ব্রজেই প্রচারিত হয়েছে। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে তা বর্ণনা করেছেন, এবং তা শুনে ভক্ত হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে অভিধেয়-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে বললেন, কৃষ্ণ-ভজনের নাম অভিধেয়-ভক্তি। এই ভজন ব্যতীত জীবের আর কোন গতি নেই।

মুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর কামনা নেই। অর্থাৎ কর্ম, যোগ এবং জ্ঞান—এরা ভক্তির মুখ নিরীক্ষণ করে আছে। এদের সাধনের ফল অত্যন্ত তুচ্ছ, কৃষ্ণ ভক্তির সাহায্য ব্যতীত এরা নিজ নিজ ফল দিতে অসমর্থ। এদের কারোরই নিজে থেকে ফল দেবার সামর্থ্য নেই। সে সম্বন্ধে নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, "নিরুপাধি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি রহিত হলে ফলপ্রসূ হয় না। তখন জীবের অকাম কর্ম বা সকাম কর্ম ভগবানে সমর্পিত না হলে পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।" শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন, "তপশীল, দাতা, যশস্বী, যোগী, মন্ত্রবেত্তা এবং সদাচারী আদি মহাজনেরা তাদের তপস্যা আদি মহান কর্মসমূহ ভগবানের চরণে অর্পণ না করেন, তা হলে তাদের মঙ্গল

হয় না।" এই ধরনের শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা কৃষ্ণভক্তির মহিমা বর্ণনা করে মহাপ্রভু বোঝালেন যে, ভক্তি ছাড়া কেবল কর্ম বা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণসেবা পরায়ণ ভক্ত জ্ঞানহীন হলেও কেবল ভক্তি সাধনের দ্বারা মুক্তি লাভে সমর্থ হন। যারা সর্ব শুভকারী এবং মঙ্গলময় ভক্তিপথ লঙ্ঘন করে কেবল শুদ্ধ জ্ঞানলাভের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে পরিশ্রম করে, তাদের সেই শ্রম সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হয়। জীব যখন ভুলে যায় যে সে কৃষ্ণের নিত্যদাস, তখন মায়া তার গলায় ত্রিগুণের শৃঙ্খল পরিয়ে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু জীব যখন শ্রীগুরুদেবের সেবা ও শ্রীকৃষ্ণের ভজনা শুরু করে, তখন মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং সে তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করে। কেউ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করে ও শ্রীকৃষ্ণের ভজনা না করে, তা হলে সেও নরকগামী হয়।

"হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হলাম," এই বলে যে একবার প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণ তাকে চিরদিনের জন্য অভয় প্রদান করেন। এটি তাঁর ব্রত।

অনেকে বিষয়-সুখ প্রত্যাশায় প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। পরে বিষয় যখন আর ভাল লাগে না, তখন তিনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের দাস হবার ইচ্ছা করেন। ধ্রুব

শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে প্রভু! মানুষ কাঁচ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তেমনই রাজসিংহাসন লাভ করার জন্য তপস্যা করে মনীন্দ্রদেহ দুর্লভ তোমাকে পেয়েছি। প্রভু! এতেই আমি কৃতার্থ হলাম, আমি আর অন্য কোনও বর চাই না।"

তারপর সাধুসঙ্গের অভাব বর্ণনা করে মহাপ্রভু বললেন, নদীর স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন দৈবযোগে কূলে এসে উপস্থিত হয়, তেমনই সংসার-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোনও ভাগ্যবান জীব যদি ভগবানের চরণে ভক্তিলাভ করতে পারেন, তা হলে তিনি ভবসাগর পার হতে পারেন। ভগবানের কৃপায় তখন তাঁর সংসার-বাসনা দূর হয় এবং সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভগবানে রতি জন্মায়। রতি জন্মালেই তার সদ্গতি লাভ হয়।

ভগবানের কৃপার ফলে জীবের ভাগ্যে সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁরই কৃপায় সদ্গুরু লাভ হয়। তিনি গুরু এবং অন্তর্যামীরূপে এই সমস্ত ভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে ভক্তিশিক্ষা দান করেন।

মহতের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও কর্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। যতদিন না নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত সাধুদের পদরজদ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায়, ততদিন শ্রীভগবানের চরণে রতি জন্মায় না; সমস্ত শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম, যোগ, জ্ঞান আদি বর্ণনা করে গুহ্যতম বিষয় ভগবদ্ভক্তির কথা বর্ণনা করে বলেছেন, " তুমি আমাতে মন অর্পণ করে আমাকে ভজনা কর, আমার অর্চনে নিরত হও এবং আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয়, অতএব আমি শপথ করে বলছি তুমি আমাকে লাভ করবে।"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলেছিলেন, "যে পর্যন্ত আমার লীলা-কথা বা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মাবে, ততক্ষণ সাধক কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মেরই অনুষ্ঠান করবে।"

শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস। ভগবানের লীলাকথায় সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তি-সাধনের অধিকারী। শ্রদ্ধা অনুসারে ভক্ত উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভক্তির অধিকারী হন। তবে ভক্তি অনুশীলনের ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত ক্রমে ক্রমে ভক্তে পরিণত হন।

ভগবানের চরণে যাঁর অচলা ভক্তি রয়েছে তার মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণই দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত গুণ সাধু-বৈষ্ণব মহাপুরুষের লক্ষণ। বৈষ্ণবের গুণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশিরই সঞ্চার হয়। বৈষ্ণবের গুণগুলি হচ্ছে—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

তারপর মহাপ্রভু অসৎ সঙ্গের বর্ণনা করে বললেন—মহাজনেরা সাধুসেবাকে ভগবদ্ভক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গকে নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এই সাধুসঙ্গের দ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। ভক্তিমার্গ সাধনের এইটিই প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ এবং অসাধুর সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাজ্য। তার ফলে সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

এই সমস্ত অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে বর্ণাশ্রম ধর্মাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করলে তিনি

জীবের সমস্ত পাপ মোচন করেন। শরণাগত ভক্তকে ভক্তবৎসল ভগবান আপন করে নেন।

তারপর মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে সাধন-ভক্তির কথা বললেন। এই সাধন-ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ হয়। অনুকূল ভাবের সঙ্গে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ সেই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান-কর্মাদির সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদনের ফলে সেই স্বরূপ-লক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তা কখনও শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র শ্রবণাদির দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্তে তার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্তনাদির ক্রিয়াই প্রধানত সাধন-ভক্তি; তা দুই প্রকার—বৈধ ও রাগানুরাগা। যাদের হৃদয়ে রাগের উদয় হয় নি, শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে তাদের যে ভজন প্রবৃত্তি হয়, তাই বৈধীভক্তি। এই বৈধীভক্তির গুরুপাদাশ্রয় আদি চৌষট্টি প্রকার সাধনাঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তি সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই পঞ্চ অঙ্গের অল্প সঙ্গ হলেই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

সব রকম কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে যিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাঁর আর দেবতা, ঋষি, রাজা, পিতা আদি কারো কাছে কোনও ঋণ থাকে না। যিনি বিধি-মার্গ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করেন, তাঁর মন কখনও পাপ পথে ধাবিত হয় না। এখানে বিধিধর্ম বলতে কাম্য কর্মবিধিকে বোঝানো হয়েছে। ভক্ত্যঙ্গের অর্চনাদি বিধিধর্ম অনুশীলন পরিত্যাজ্য নয়। এই সমস্ত বিধি কর্মত্যাগী ভক্তেরা যদিও অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তিবশত কোন পাপাচরণ করেন, ভক্তবৎসল ভগবান কোনও প্রায়শ্চিত্তব্যতীতই তাদের পবিত্র করেন। জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি কখনই এর অঙ্গ নয়। অহিংসা, যম, নিয়মাদি সদ্‌গুণ আপনা থেকেই ভগবদ্ভক্তে প্রকাশিত হয়।

তারপর মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তির বর্ণনা করে বললেন—ব্রজবাসী ভক্তদের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাই মুখ্য। অর্থাৎ, সেই রকম ভক্তি আর কোথাও নেই। ব্রজবাসীর অনুগত যে ভক্তি, তারই নাম রাগানুগা ভক্তি। অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তার নাম রাগ বা অনুরাগ। ভগবানের প্রতি এই যে অনুরাগময়ী ভক্তি, তা রাগাত্মিকা ভক্তি। ইষ্ট বস্তুতে যে গাঢ় তৃষ্ণা,

তাই রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, আর ইষ্ট বস্তুতে যে আবিষ্টতা বা তন্ময়তা, তাই তার তটস্থ লক্ষণ। যদি কোনও ভাগ্যবান ব্রজবাসী ভক্তের এই রাগময়ী ভক্তির কথা শুনে লোভাকৃষ্ট হন তাহলে তাঁকে ভগবৎ-পার্ষদ কোনও ব্রজবাসীর অনুগত হয়ে এই রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। এই রাগানুরাগা বা রাগাত্মিকা ভক্তি শাস্ত্রযুক্তি মানে না। অর্থাৎ, লোভ উৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে না, কিন্তু লোভ উৎপন্ন হলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে; তা না হলে ভজন পদ্ধতি জানবার উপায় থাকে না।

এই সর্বশ্রেষ্ঠা রাগানুগা ভক্তি সাধকের সাধন প্রণালী দুই প্রকার। বাইরে সাধক-দেহে বৈধীভক্তি সাধনের ন্যায় শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান এবং অন্তরে ব্রজভাবের কোন সখী বা পিতা-মাতাকে আদর্শরূপে অবলম্বন করে সিদ্ধ-দেহে ব্রজে দিবারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সেবন। এই রাগানুরাগা ভক্তি সাধনে ভগবানকে আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ, সুহৃদ্‌তুল্য বিশ্বাসী, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সখাতুল্য রহস্যজ্ঞ, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজনীয় এবং দেবতাদের ন্যায় বাঞ্ছাপূর্ণকারী বোধ করে ভক্ত-সাধকগণ তাঁকে ভজনা করেন। এই রাগানুরাগা ভক্তি সাধনে সাধকের

হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রেমের উদয় হয়। সেই প্রেম অঙ্কুরিত হলে তা থেকে রতি ও ভাব জন্মায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রতি ও ভাবের গাঢ়তা জন্মালে তিনি ভক্তের বশীভূত হন।

বস্তুত রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব ব্রজের নিগূঢ় রসপূর্ণ, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার শক্তি কারো নেই।

তারপর মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হলে তা 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। তাকে বলা হয় কৃষ্ণভক্তি রসের 'স্থায়ী ভাব'। প্রেম-সূর্যের কিরণ সদৃশ বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ রুচির দ্বারা চিত্ত নির্মল হলে হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়।

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করে অত্যন্ত মমতার দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়রূপ হয়, তখন তাকে পণ্ডিতেরা 'প্রেম' বলেন। কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের হৃদয়ে যদি শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করেন। সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তন হয়, এবং তার ফলে সব রকম অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অনর্থ নিবৃত্তি হলে ভগবৎ-ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মায়। নিষ্ঠা থেকে ভগবানের নামে রুচি হয়। রুচি থেকে

আসক্তি। আসক্তি থেকে ভাব; এবং এই ভাব গাঢ় হলে সাধকের হৃদয়ে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমই সমস্ত আনন্দের আধার এবং জীবের পরম প্রয়োজন।

যার হৃদয়ে এই ভাবের উদ্‌গম হয়, তার মধ্যে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, মানাভিমানশূন্যতা, বিরাগ, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, ভগবানের নামগানে রুচি, ভগবানের গুণ বর্ণনায় আসক্তি এবং ভগবানের বসতি স্থানে প্রীতি, এই নয়টি গুণ জন্মানোর ফলে আর প্রাকৃত ক্ষোভে তার হৃদয় কখনও ক্ষুব্ধ হয় না।

এই ধরনের সাধকেরা কৃষ্ণগুণ-কীর্তন ব্যতীত অন্য কথায় বৃথা কালক্ষয় করেন না। নিরন্তর বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং দেহের দ্বারা প্রণতি ও নেত্রজলে অভিষিক্ত হয়ে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। মহারাজ ভরত ভগবানের চরণাশ্রয় লাভের অভিলাষী হয়ে চিত্র পুত্তলিকার মত হৃদয়ে নিয়ত বিরাজমান স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ এবং রাজ্যসুখকে যৌবন অবস্থাতেই মলবৎ পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজ-চক্রবর্তী এই মহারাজ ভরত ভগবানের ভজনে একান্ত রত

হয়ে ভিক্ষার জন্য শত্রু পুরীতে গমন করে চণ্ডালকে পর্যন্ত মান্য করেছিলেন। সর্বোত্তম ভক্ত "কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করবেন" এই মনে করে নিজেকে হীন বলে জ্ঞান করেন। তাঁর মন কৃষ্ণকথা শ্রবণে সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে। তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণলীলাস্থলী পবিত্র স্থানে বাস করতে অভিলাষ করে। এ সবই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতির চিহ্ন। তারপর মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্নসমূহ একে একে শ্রীসনাতনকে বলেন।

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাব হয় ॥"

ইক্ষুরস অগ্নিতাপে পাক হতে যেমন গুড়, শর্করা, মিছরিরূপে পরিণত হয়ে ক্রমে পরিষ্কৃত ও মিষ্টাধিক্যে মধুর থেকে মধুরতর হয়, তেমনই প্রেম ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘনীভূত অবস্থায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে পরিণত হয়।

পূর্বে যে রতির কথা বলা হয়েছে, তা অবস্থাভেদে সাধকের হৃদয়ে পঞ্চবিধ রূপে উদিত হয়। শান্ত রস প্রেম পর্যন্ত উঠতে পারে। সনক, সনাতন প্রভৃতি মুনিগণ এই শান্ত রসের সাধক। দাস্য রস রাগ পর্যন্ত উঠতে পারে। কৃষ্ণের সারথি দারুক এই দাস্য রসের অধিকারী। সখ্য ও বাৎসল্য রস অনুরাগ পর্যন্ত উঠতে পারে। অর্জুন ও নন্দ মহারাজ এই রসের অধিকারী। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত উঠতে পারে। মধুর রসের সম্ভোগ অবস্থাতেই ভগবানের প্রতি ভক্তের স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদির উদয় হয়। সত্যভামা ভক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করেছিলেন। অভিমানিনী শ্রীরাধিকা তাঁর কুঞ্জ থেকে ভর্ৎসনা করে তাঁকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মধুর রস মহাভাবে পরিণত হলে, তা থেকে দুটি ভাব ভক্তের হৃদয়ে উদিত হয়। একটির নাম রূঢ়; অপরটির নাম অধিরূঢ়। দ্বারকাবাসিনী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদের রূঢ়ভাব, ব্রজসুন্দরীদের অধিরূঢ় ভাব। এই দুইটি ভাব কেবলমাত্র মধুর রসের রসিব ভক্তদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

এই অধিরূঢ় ভাব আবার দুই প্রকার। সম্ভোগ অবস্থার নাম মাদন এবং বিরহাবস্থার নাম মোহন।

প্রেম সর্ববিধ ভাবের উদ্‌গমে উল্লাসী হলে তাকে মাদন বলে। মাদনে চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি রসবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়; এবং মোহনে উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পরূপ নানা বিভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিরহ বিবশতাহেতু নানাবিধ চেষ্টার নাম উদ্ঘূর্ণা। সেই উদ্ঘূর্ণা দিব্যোন্মাদ ভেদ। এই মোহনাক্ষ মহাভাব অনির্বচনীয় প্রাপ্ত হলে ভ্রান্তিময়ী বৈচিত্র্য জন্মায়। তাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদ ভাবে বিভোর হয়ে ভক্ত সমস্ত বস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করেন। এমন কি নিজেকে পর্যন্ত কৃষ্ণজ্ঞান হয়।

তারপর মহাপ্রভু শৃঙ্গার রসের বর্ণনা করে বললেন, শৃঙ্গার রস দুই প্রকার। যথা—সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। আনুকূল্যময় দর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি সেবন দ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাস বর্ধনকারী যে ভাব, তাকে সম্ভোগ বলে। আর যুক্ত অথবা অযুক্ত নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গনাদি অপ্রাপ্তি নিবন্ধন উৎকর্ষ সাধক এবং সম্ভোগের উন্নতি সাধক যে ভাব তার নাম বিপ্রলম্ভ।

এই সমস্ত ভাবগুলি কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ী ভাব। তাতে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী ভাবের সম্মিলন হয়, তাহলে—

দধি যেন খণ্ড মরিচ-কর্পূর মিলনে।
রসালাক্ষ রস হয় অপূর্বাস্বাদনে॥

বিভাগ দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। ভগবানের দর্শন আলম্বন, বংশীধ্বনি শ্রবণ উদ্দীপন। রসের আলম্বন নায়ক-নায়িকা আশ্রয় ভক্ত। এই আলম্বন এবং আশ্রয় ভিন্ন রাসকেলী বা রাসলীলা সম্পন্ন হয় না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি এবং শ্রীমতী রাধিকা নায়িকার শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণ চৌষট্টিটি মহাগুণের আধার এবং এই জন্য তিনি গুণমণি, এবং শ্রীমতী রাধিকা অনন্ত গুণশালিনী হলেও পঁচিশটি গুণ তাঁতে প্রধানভাবে অধিষ্ঠান করে। এই গুণের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করেছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কান॥
অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩/৬৬, ৬৯ ও ৮৬)

তারপর মহাপ্রভু বললেন—

নায়ক, নায়িকা,— দুই রসের 'আলম্বন'।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ, —রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতাপিতা আশ্রয়ালম্বন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩/৯২-৯৩)

সবশেষে মহাপ্রভু বললেন, "সনাতন! তোমাকে এই যে ব্রজের নিগূঢ় রসতত্ত্বের কথা বললাম, তা অভক্তদের এবং সাধারণ লোকের আস্বাদ্য নয়। বিশেষ গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্তরা ব্রজের এই উজ্জ্বল রসাস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিত্য পার্ষদ সহ অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সবচাইতে অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর প্রভু এবং শ্রীবাস ঠাকুর। এই চার পার্ষদ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় পঞ্চতত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই রূপটি হচ্ছে ভক্তের রূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন ভক্ত-স্বরূপ, অদ্বৈত প্রভু ভক্ত-অবতার, গদাধর প্রভু ভক্ত-শক্তি এবং শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছেন ভক্ত। এই পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় জগৎকে প্লাবিত করার জন্য। ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান জীবকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দান করেছেন।

শ্রীরূপ শিক্ষা

শ্রীরূপ ছিলেন তৎকালীন বাংলার নবাব হুসেন শাহের অর্থমন্ত্রী। তিনি ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত কর্ণাটকি ব্রাহ্মণ, কিন্তু মুসলমান নবাবের

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি এবং তাঁর ভাই সনাতন গোস্বামী জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের দুজনকে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরা হেলাভরে রাজপদ পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তাঁরা পথের ভিখারীর মতো নিঃস্ব জীবন অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীরূপ প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীসনাতনও রাজকার্য ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন, এই আশঙ্কা করে নবাব সনাতনকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। কিন্তু কারাধ্যক্ষকে বহু অর্থ উৎকোচ দিয়ে সনাতন কারামুক্ত হন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন হয় প্রয়াগে। সেখানে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এক নিভৃত স্থানে বসে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলেছিলেন, "ভক্তিরস-সমুদ্র অতি গভীর এবং অসীম। পূর্ণরূপে তার বর্ণনা করা অসম্ভব, তবে তার একটুখানি আমি তোমাকে আস্বাদন করাবার চেষ্টা করব।

"ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে জীব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করে পুনরায় তাকে শত শত ভাগ করলে যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু হয় জীব তার থেকেও সূক্ষ্ম।

জীব স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার। গাছপালা, তৃণগুল্ম আদি স্থাবর, এবং পশু পাখি, কীট-পতঙ্গ, মানুষ এরা জঙ্গম। জঙ্গম প্রাণীরা তিন ভাগে বিভক্ত — (১) তির্যক, (২) জলচর এবং (৩) স্থলচর। এই স্থলচর জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই অসভ্য। মানুষ যখন বেদ-বিহিত আচরণ করে তখনই কেবল তাকে সভ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এই বৈদিক ধর্মচারী মানুষদের মধ্যে আবার অনেকেই কর্মী। সহস্র সহস্র কর্মনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে একটিও জ্ঞানী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে আবার সচারাচর দু'একজন মুক্ত পুরুষ দেখা যায়। আবার কোটি জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে একটি কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ। ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিকামী পুরুষেরা অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত, কেননা তিনি নিষ্কাম।

ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করতে করতে যদি কোন সৌভাগ্যবান জীব শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন এবং মালীর মতো যত্ন করে তা হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করে তার মূলে শ্রবণ-কীর্তনরূপ সাধন-জল সিঞ্চন করেন, তা হলে একদিন না একদিন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে লতারূপে বর্ধিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে উঠবে। তা বিরজা, ব্রহ্মালোক ভেদ করে পরব্যোম পার হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে। সেই ভক্তিলতা তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় লাভ করবে। সেখানে বিস্তারিত হলে তাতে প্রেমফল ফলবে। কিন্তু এই ভক্তিলতার মূলে অতি সাবধানে শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করতে হবে, যাতে তার মূল সর্বদা সরস থাকে। সব সময় খুব সাবধান থাকতে হবে, মত্ত-হস্তিরূপ বৈষ্ণব অপরাধ সেই ভক্তিলতাটিকে বিধ্বস্ত না করে ফেলে এবং ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহারূপ উপশাখা এবং নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদিরূপ পরগাছা এবং সন্দেহরূপ খুটিনাটির উদ্গম না হয়। তাহলেই ভক্তিলতা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় লাভ করতে সমর্থ হবে। তখন তাতে ফুল-ফল ধরবে।

ভক্ত-মালী এই ভক্তিল তা অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষের ফল প্রেমধন প্রাপ্ত হন। এই প্রেমফলের আস্বাদনে তিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করেন, যার কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মোক্ষও তুচ্ছ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বললেন—

"অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৬৮-১৬৯)

শুদ্ধভক্তি থেকেই প্রেম উৎপন্ন হয়। শুদ্ধভক্তির প্রকৃত অর্থ উত্তমা ভক্তি। অন্য সমস্ত বাসনা, অন্য পূজা, কর্ম, জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য যে ভক্তি তারই নাম শুদ্ধভক্তি। শুদ্ধভক্তি থেকেই প্রেমের উদয় হয়। পিশাচীতুল্য দুঃখদায়িনী ভুক্তি-মুক্তির বাসনা হৃদয়ে উদিত হলে সে হৃদয়ে কি প্রেমের বীজ রোপণ করা সম্ভব? সে হৃদয় কি ভক্তিসুখের আধার হতে পারে?

হৃদয়ে কর্মফল ভোগ-বাসনা থাকলে অথবা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থাকলে, সেই ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানুষের ভক্তি-সাধনায় কোন ফল হয় না। অর্থাৎ, সাধন-ভক্তির ফল যে প্রেম, তা লাভ হয় না।

সাধন ভক্তি থেকে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হলে তার নাম হয় প্রেম। প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়।

প্রেম কাকে বলে তার বিশ্লেষণ করে মহাপ্রভু বলেছেন,—যা থেকে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয় এবং যার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা উৎপন্ন হয় এবং সেই ঘনীভূত ভাবকে প্রেম বলা হয়। প্রেম থেকেই প্রেমভক্তির উদয় হয়।

প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়ে যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাকে বলা হয় স্নেহ। স্নেহ ক্ষণিকের বিরহও সহ্য করতে পারে না। স্নেহ গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়ে যখন চিত্তকে নব-মাধুর্য অনুভব করিয়ে বাহ্য দৃষ্টিতে অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য প্রদর্শন করে, তাকে তখন মান বলা হয়। মান গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্রম্ভ ধারণ করলে তাকে প্রণয় বলে। প্রিয়জনের সঙ্গে অভেদ মনকে বিশ্রম্ভ বলে। যে

প্রণয়-গাঢ়তাবশত কৃষ্ণ সঙ্গাদিতে অধিকতর দুঃখকেও চিত্তে সুখরূপে অনুভব করায়, তাকে বলা হয় রাগ। যে রাগ গাঢ়তাবশত নবনবায়মান হয়ে প্রিয়তম সর্বদা অনুভূত হলেও নবনবায়মানরূপে অনুভব করায়, তাকে বলা হয় অনুরাগ। অনুরাগ ঘনীভূত হয়ে ভাব নামে অভিহিত হয়। সর্বশেষে মহাপ্রভু মহাভাবের কথা বললেন। এই মহাভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণী ও ব্রজদেবীদের যে ভাব তাকে মহাভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার মহিষীবর্গের পক্ষেও এ ভাব দুর্লভ। শ্রীরাধিকা মহাভাব-স্বরূপিনী এবং ব্রজ-গোপিকারা তাঁর এই ভাবের সাহায্যকারিণী। প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ-এ সবই স্থায়ী ভাব।

এই স্থায়ী ভাবের বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,—যিনি অনিরুদ্ধ (হাস্যাদি) ও বিরুদ্ধ (ক্রোধাদি) ভাবকে বশীভূত করে সুরাজার মতো বিরাজমান থাকেন, তাকেই স্থায়ী ভাব বলে। ভক্তি-প্রবরণে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতি স্থায়ী ভাব।

তারপর বিভাব কি, তার বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

বললেন, রতি আদি যাতে বিভাবিত হয়, তাকে আলম্বন বিভাব, এবং যার দ্বারা রতি আদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। রতির বিষয় এবং আধার ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ। তার মধ্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলে, আর রতির আধার অন্তরঙ্গ ভক্তকে আশ্রয়ালম্বন বলে।

যে বস্তু ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, তাকে উদ্দীপন বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, বেশ, মন্দ হাস্য, শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, শ্রীবৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসরাদি উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব কি, তা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বললেন, "চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্যকে অনুভাব বলে। অনুভাবের লক্ষণ গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, গাত্র মোড়ামুড়ি, হুঙ্কার, হাই তোলা, শ্বাসবাহুল্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি।

তারপর মহাপ্রভু অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে বললেন, এই পূর্বোক্ত ভাবের সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের মিলনে কৃষ্ণভক্তিরসের অপূর্ব আস্বাদন হয়।

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অথবা তা থেকে একটু ব্যবধান বিষয়ক ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হলে তাকে সত্ত্ব বলা হয়। এই সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাব ত্রিবিধ—স্নিগ্ধ, দগ্ধ ও রুক্ষ। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসমূহ এই তিনটি লক্ষণে বিভক্ত। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবগুলি হচ্ছে—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।

তারপর মহাপ্রভু ব্যভিচারী ভাব বর্ণনা করলেন। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ প্রকার। কখনো প্রাদুর্ভূত, কখনো বা তিরোহিত—এই প্রকারে যে সমস্ত ভাব স্থায়ী ভাবের অভিমুখে প্রতিভাত হয়, তারাই স্থায়ী ভাব। এরা সব রকম ভাবের সঞ্চার করে বলে এদের সঞ্চারী ভাবও বলা হয়। স্থায়ী ভাব সমুদ্রের মতো, আর সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবগুলি সেই সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। এরা ক্রমশ স্থায়ী ভাবসমূহের রূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতিরূপ স্থায়ী ভাব শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা পুষ্ট হয়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব এবং ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ভক্ত-হৃদয় বিশেষভাবে পুষ্ট হয়ে তাতে ভক্তিরসের সৃষ্টি করে। স্নেহ আদি যেমন প্রেমের স্থায়ী ভাব, তেমনি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই

পাঁচটিও প্রেমের স্থায়ী রস ও স্থায়ী ভাব। ভক্ত পঞ্চবিধ, সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুত রতি এক, কিন্তু ভক্তভেদে তা পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত হয়।

যা থেকে বিষয়-বাসনা দূরীভূত হয় এবং মন নিজানন্দে অবস্থান করে, সেই ভাবকে বলা হয় শান্ত রতি বা শম। শমগুণ প্রধান সাধুরা প্রায়ই মমতা গন্ধ রহিত। পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণকে জেনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের যে রতি, তাকে বলা হয় শান্ত রস। দাস্যভাবকে প্রীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা নিজেদের ভগবানের থেকে হীন বলে মনে করেন, তাঁরা ভগবানের অনুগ্রহপ্রার্থী। ভগবান তাঁদের আরাধ্য—সেবার বস্তু। প্রীতিসেবা দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে হয়। এইরূপ জ্ঞানের নাম দাস্য রতি। শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি—তাঁর সেবা ছাড়া অন্য কার্যে অপ্রীতি, এটিই হচ্ছে দাস্য রতির ধর্ম।

যাঁরা নিজেদের ভগবানের সমতুল্য বলে মনে করেন, তাঁদের সখা বলে। ভগবানের সঙ্গে পরিহাস, উচ্চ হাস্যাদি এই সখ্য ভাবের কার্য।

যাঁরা নিজেদের ভগবানের গুরু বলে মনে অভিমান করেন,

শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের স্নেহের বস্তু, আদরের ধন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহময়ী যে রতি, তার নাম বাৎসল্য রতি। লালন-পালন, আশীর্বাদ করা, চিবুক স্পর্শন আদি দ্বারা আদর করা বাৎসল্য রসের চেষ্টা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রেয়সী ভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ, এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব, তার নাম মধুর রতি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মধুর রসের ভক্তদের এই যে সম্ভোগ, তা আট প্রকার। যথা—স্মরণ, কীর্তন, দর্শন, কেলি, গুহ্য ভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া-নিবৃত্তি। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী, এবং মন্দহাস্য মধুর রসাশ্রিত ভক্তদের চেষ্টা।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চবিধ ভক্তের পঞ্চবিধ রসের কথা বলে এই পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করেছেন। শান্ত রসের সাধকেরা শ্রবণ দ্বারা তাঁদের হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ করেন। শান্ত ভক্তেরা পরমাত্মা, পরব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে ভগবানকে দর্শন করেন। শান্ত রসে মহোপনিষদ শ্রবণ এবং নির্জন স্থানে সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন।

দাস্য ভক্তি রসে প্রীতির বাহুল্য দেখা যায়। দাস্য ভক্তি-রসকে প্রীতি ভক্তিরসও বলে। এই প্রীতিভক্তি রসে ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্রে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজরূপে ঈশ্বর পরমারাধ্য, এবং সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। ভগবানের কৃপা, চরণ-রজ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি এবং তাঁর ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব যথাসম্ভব দৃষ্ট হয়। শ্রম, মদ, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্র, অমর্য, অসূয়া এবং নিদ্রা ব্যতীত ব্যভিচারী ভাবসকলও দৃষ্ট হয়।

স্থায়ী সখ্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পরিপুষ্ট হলে তাকে সখ্যভক্তি রস বলে। সখ্য রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, সুখী প্রভৃতি গুণশালী পূর্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের আলম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম, বিক্রম ও তাঁর প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কেলি এবং পরিহাসাদি অনুভাব। এই সখ্য রসে সব ক'টি সাত্ত্বিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী ভাবও দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের স্নেহের বস্তু, আদরের ধন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহময়ী যে রতি, তার নাম বাৎসল্য রতি। লালন-পালন, আশীর্বাদ করা, চিবুক স্পর্শন আদি দ্বারা আদর করা বাৎসল্য রসের চেষ্টা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রেয়সী ভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ, এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব, তার নাম মধুর রতি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মধুর রসের ভক্তদের এই যে সম্ভোগ, তা আট প্রকার। যথা—স্মরণ, কীর্তন, দর্শন, কেলি, গুহ্য ভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া-নিবৃত্তি। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী, এবং মন্দহাস্য মধুর রসাশ্রিত ভক্তদের চেষ্টা।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চবিধ ভক্তের পঞ্চবিধ রসের কথা বলে এই পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করেছেন। শান্ত রসের সাধকেরা শ্রবণ দ্বারা তাঁদের হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ করেন। শান্ত ভক্তরা পরমাত্মা, পরব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে ভগবানকে দর্শন করেন। শান্ত রসে মহোপনিষদ শ্রবণ এবং নির্জন স্থানে সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন।

দাস্য ভক্তি রসে প্রীতির বাহুল্য দেখা যায়। দাস্য ভক্তি-রসকে প্রীতি ভক্তিরসও বলে। এই প্রীতিভক্তি রসে ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্রে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজরূপে ঈশ্বর পরমারাধ্য, এবং সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। ভগবানের কৃপা, চরণ-রজ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি এবং তাঁর ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব যথাসম্ভব দৃষ্ট হয়। শ্রম, মদ, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্র, অমর্য, অসূয়া এবং নিদ্রা ব্যতীত ব্যভিচারী ভাবসকলও দৃষ্ট হয়।

স্থায়ী সখ্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পরিপুষ্ট হলে তাকে সখ্যভক্তি রস বলে। সখ্য রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, সুখী প্রভৃতি গুণশালী পূর্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের আলম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম, বিক্রম ও তাঁর প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কেলি এবং পরিহাসাদি অনুভাব। এই সখ্য রসে সব ক'টি সাত্ত্বিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী ভাবও দৃষ্ট হয়।

বাৎসল্য ভক্তি রস মধুর রসের নিম্নে অবস্থিত। এই বাৎসল্য ভক্তিরসে মমতা, স্নেহ প্রভৃতি গুণ বর্তমান। স্থায়ী বাৎসল্য রতি বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্ত যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন হৃদয়ে যে রস সৃষ্টি হয়, তার নাম বাৎসল্য ভক্তিরস। সর্ববিধ সৎ লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয় বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যদের মানকারী এবং দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বাৎসল্য রসের বিষয়ালম্বন। মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন এই রসের আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চাপল্য প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তক-ঘ্রাণ, কর দ্বারা অঙ্গ মার্জন, আশীর্বাদ, আদেশ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ দানাদি অনুভাব। এই বাৎসল্য রসে স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক এবং স্তন্যস্রাব ইত্যাদি ভাবসকলও দৃষ্ট হয়।

সমস্ত রসের শ্রেষ্ঠ মধুর রস। স্থায়ীভাব মধুর রতি স্বযোগ্য বিভাবাদির দ্বারা ভক্ত-হৃদয় পুষ্টিপ্রাপ্ত হলে তাকে মধুর ভক্তিরস বলে। এই মধুর রসে অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য, লীলা ও বৈদগ্ধির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-আলম্বন। তাঁর প্রেয়সীবর্গ আশ্রয়-আলম্বন। নব জলধর ময়ূর পুচ্ছ, মুরলী-ধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। কটাক্ষ, মন্দহাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব এবং

আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্বেদাদি ব্যাভিচারী ভাবসকল এই মধুর রসে পরিলক্ষিত হয়। এই মধুর রতির উপর আর কোন রতিও নেই, রসও নেই।

এই পঞ্চবিধ মুখ্য রসের কথা বলে মহাপ্রভু সাত প্রকার গৌণ রসের কথা বললেন। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, করুণ, বীভৎস ও ভয়, এই সাত প্রকার গৌণ্য রস পঞ্চবিধ ভক্তে পরিদৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণভক্তি রস দুই ভাগে বিভক্ত—বৈধী ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি। বৈধী ভক্তি ঐশ্বর্য ও জ্ঞানমিশ্রিত। কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তি ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিহীন তা শুদ্ধ এবং অহৈতুকী। এই ভক্তি কেবল গোকুলে ব্রজবাসীতে বিদ্যমান। এই রাগাত্মিকা রতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব ও দেবকীর চরণ বন্দনা করলেন, তখন তাঁদের পুত্রবুদ্ধি নষ্ট হল এবং শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি হল, এবং সেইজন্য তাঁর কাছে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করবেন বলে ভয় দেখালে রুক্মিণীদেবী মহাভীতা হয়ে ভূতলে নিপতিত

হলেন। কিন্তু মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অনেক অলৌকিক কার্য দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁকে পুত্রজ্ঞানে রজ্জু দ্বারা উদুখলে বন্ধন করেছিলেন। শ্রীদামাদি সখারা বন্ধুভাবে তাঁর স্কন্ধে চড়ে বেড়াতেন। ব্রজগোপিকারা বৃন্দাবনের বনে তাঁকে খোঁজবার সময় তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করে নারায়ণ জ্ঞানে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেছিলেন, কিন্তু তিনিই যে তাঁদের পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ, তা বুঝতে পারেন নি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি প্রদত্ত শিক্ষা

কাশী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিভাব তারা বুঝতে পারে না। তাই তারা মহাপ্রভুর নিন্দা করে। প্রভুর নিন্দা শুনে ভক্তরা মর্মাহত হন। দুঃখিত হয়ে তাঁরা মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বলেন, "প্রভু! আপনার নিন্দা আর কত শুনব? এই অসহ্য নিন্দা শ্রবণ করার থেকে নিস্তার লাভের জন্য আমরা জীবন ত্যাগ করব বলে সংকল্প করেছি।"

সে কথা শুনে মহাপ্রভু ঈষৎ হাসলেন। আর সেই সময়ে এক বিপ্র এসে মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—

"এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া।
সকল সন্ন্যাসী মুই কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন॥ "

ঈষৎ হেসে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তারপর সেই বিপ্র-ভবনে গিয়ে দেখলেন সেখানে সমস্ত সন্ন্যাসীরা উপস্থিত। তাদের নমস্কার করে এবং পাদপ্রক্ষালন করে সেইখানেই তিনি বসলেন এবং বসে কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন; মনে হল তাঁর মহাতেজময় বপু যেন কোটি সূর্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তা দেখে সমস্ত সন্ন্যাসীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর সামনে এসে সসম্ভ্রমে বললেন, " শ্রীপাদ! এই তুচ্ছ অপবিত্র স্থানে আপনি কি দুঃখে উপবেশন করলেন? আসুন আপনার জন্য সভার মধ্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। মহাপ্রভু তখন অতিশয় দীনভাবে করজোড়ে তাকে বললেন, "আমি অতি হীন সম্প্রদায়ের ভক্ত। আপনাদের এই সভাতে বসবার যোগ্য নই।"

শ্রীশংকরাচার্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন বন, অরণ্য, পর্বত, কানন, সরস্বতী, আশ্রম, তীর্থ, গিরি, পুরী, ভারতী। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড শংকরাচার্য কেড়ে নিয়েছিলেন এবং ভারতীর দন্ড ভেঙ্গে অর্ধেক রেখেছিলেন। এভাবে গুরুদণ্ডিত বলে ভারতী সম্প্রদায়কে শংকর সম্প্রদায়হীন বলে গণ্য করা হয়। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই জন্য অবজ্ঞা করে মহাপ্রভুকে লোক দিয়ে একথা বলে পাঠিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই কথা তুলে প্রভুকে পুনরায় যোগপত্র দিতে চেয়েছিলেন। প্রভু সেই পুরান কথা উঠিয়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাই বললেন—

আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোরে বসিতে না যুয়ায় ॥

মহাপ্রভুর এই দৈন্যোক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী লজ্জিত হয়ে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলে সসম্ভ্রমে প্রভুর শ্রীহস্ত ধারণ করে সভার মধ্যে নিয়ে যান এবং বহু সম্মানে যথাযোগ্য আসনে বসান।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন মহাপ্রভুকে বলেন—"আপনার

নাম আমি শুনেছি। আপনি যে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর শিষ্য তা আমি জানি। আপনি আমাদের সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গ করেন না। তার কারণ আমি বুঝতে পারি না। আর তা ছাড়া আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য-গীত কেন করেন? ভাবুকের সঙ্গে উচ্চসংকীর্তন করেন, তা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। বেদান্ত পাঠ, জ্ঞানচর্চা, ধ্যান, ধারণা এগুলি হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। আপনি আপনার সন্ন্যাসধর্ম ছাড়লেন কেন? আপনার অপূর্ব প্রভাব দেখে মনে হয় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনি এ সমস্ত হীনাচার কেন করেন?" অপরাধবশত ভক্তি-মহিমা ও ভক্ত-মাহাত্ম্য না জেনে ভগবানের নাম-কীর্তন এবং তজ্জনিত আনন্দ নৃত্যকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী হীনাচার বললেন। পরে এই সমস্ত অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন।

মহাপ্রভু তখন অত্যন্ত দীনভাবে উত্তর দিলেন, "আমার গুরুদেব আমাকে মূর্খ দেখে শাসন করে বললেন, তুমি মূর্খ, তাই তোমার বেদান্ত পাঠ করার অধিকার নেই। তুমি কেবল কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর। এই কৃষ্ণমন্ত্রই হচ্ছে সমস্ত বেদের সারাতিসার। কৃষ্ণমন্ত্র থেকে সংসার মোচন হবে, কৃষ্ণনাম থেকে তুমি শ্রীকৃষ্ণের

চরণাশ্রয় লাভ করবে। নাম বিনা কলিকালে আর কোন ধর্ম নেই। সমস্ত মন্ত্রের সার নাম—এই হচ্ছে শাস্ত্রের মর্ম।' এই বলে আমার গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়েছিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

গুরুদেবের এই আজ্ঞা পেয়ে আমি নিরন্তর নাম নিতে শুরু করলাম। আর নাম নিতে নিতে আমার মন উদ্ভ্রান্ত হল। আমি উন্মাদের মতো কখনও হাসতে লাগলাম, কখনও কাঁদতে লাগলাম, কখনও নাচতে লাগলাম, আবার কখনও বা গান গাইতে লাগলাম। তখন আমার মনে হল যে এই কৃষ্ণনামের প্রভাবে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে; আমি পাগল হয়ে গেছি। তখন আমি গুরুদেবকে গিয়ে বললাম—

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।
হাসায়ে, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন ॥

সে কথা শুনে আমার গুরুদেব আমাকে বললেন—কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইটিই স্বভাব। যে এই মহামন্ত্র জপ করে, তার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। এই কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। তার আগে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ তৃণতুল্য। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সমুদ্রের কাছে ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ এক বিন্দুর মতোও নয়। কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম, বহু ভাগ্যে তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেই প্রেমের উদয় হয়েছে। এই প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গায়, উন্মত্ত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্‌গদ্, বৈবর্ণ, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য—এতভাবে প্রেম ভক্তদের নাচায়—কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়। তুমি যে এই প্রেম লাভ করেছ, তাতে আমি কৃতার্থ হলাম। নাচ, গাও ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর, কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়ে সকলকে উদ্ধার কর। তাঁর এই নির্দেশে দৃঢ় বিশ্বাস করে আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করি। সেই কৃষ্ণনাম আমাকে গাওয়ায়, কখনও নাচায়। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় নাচি না বা গাই না। কৃষ্ণনামে যে আনন্দ আস্বাদন হয়, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ খালির অল্প জলের মতো।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখে মধুমাখা এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মন ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন বললেন, "শ্রীপাদ! আপনি যা বললেন তা সবই সত্য। যার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে, সে পরম সৌভাগ্যবান। আপনি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তা আমাদের বিশেষ সন্তোষের কারণ। কিন্তু আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? বেদান্ত পাঠ বা শ্রবণে কি দোষ হয়?"

মহাপ্রভু তখন বিনীতভাবে ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন, "শ্রীপাদ! আপনারা যদি আমার কথায় দুঃখিত না হন, তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি। আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে কোন কথা আমি বলতে চাই না। আপনারা যদি অনুমতি করেন, তবে এ সম্বন্ধে আমি কিছু নিবেদন করতে পারি।"

মহাপ্রভুর এই দৈন্যমাখা মধুর বাণী শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর সন্ন্যাসীদল সকলে একবাক্যে বললেন—

"তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।

তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥"

মহাপ্রভু তখন সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করে গভীরভাবে বলতে লাগলেন, "বেদান্ত-সূত্র ভগবানেরই বাণী। ব্যাসদেব নারায়ণ তা প্রণয়ন করেছেন। ভগবানের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই সমস্ত দোষ নেই। উপনিষদে সেই সূত্রে যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটিই হচ্ছে মুখ্য বৃত্তি। কিন্তু গৌণ বৃত্তি অবলম্বনে শঙ্করাচার্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তা শ্রবণ করলে সর্বনাশ হয়। শঙ্করাচার্যের তাতে কোন দোষ নেই। তিনি ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে গৌণ অর্থ প্রদান করেছেন।

"ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে ভগবানকেই ইঙ্গিত করা হয়। তাঁর বিভূতি, দেহ সব চিদাকার। কিন্তু তাঁর চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করে তাঁকে শঙ্করাচার্য নিরাকার বলে ঘোষণা করেছেন। তাতে তাঁর কোন দোষ নেই, কেননা তিনি হচ্ছেন আজ্ঞাবাহী দাস। কিন্তু যে

তা শোনে তার সর্বনাশ হয়। ভগবানের সচ্চিদানন্দময় কলেবরকে প্রাকৃত বলে মনে করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ।

"ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন, আর জীব তার স্বরূপে সেই অগ্নিবৃন্দের স্ফুলিঙ্গ-কণা সদৃশ। জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান। গীতা, বিষ্ণু-পুরাণ আদি শাস্ত্রে তার প্রমাণ রয়েছে।

"জীবতত্ত্ব—শক্তি বিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে অণুচৈতন্যরূপে সিদ্ধ না করে ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ করতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হবে। শ্রীশঙ্করাচার্য ভগবানের আজ্ঞাক্রমে ভগবানের ভগবত্তা আচ্ছাদন করার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সঙ্গে পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপন করে ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ব্যাসদেবের সূত্র প্রকৃতপক্ষে শক্তি পরিণামবাদে স্বীকৃত। শঙ্করাচার্য 'পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলতে হয়'—এই বির্তক উঠিয়ে পরিণামবাদ মার্গে ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করলেন। একটি সত্য তত্ত্ব থেকে অন্য একটি সত্য তত্ত্বের উদয় হলে তা নিয়ে অন্য বস্তু বলে মনে করাকে বলা হয় 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। 'ব্রহ্ম' একটি সত্য বস্তু;

তা থেকে 'জীব'-রূপ একটি সত্য বস্তু ও 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'-রূপ একটি সত্য বস্তু পৃথকরূপে হয়েছে—এইরূপ বিবৃতিকে 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ হল—'দুগ্ধ' একটি সত্য পদার্থ, তা-ই 'দধি'-রূপ অন্য সত্য পদার্থরূপে বিকৃত হয়। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম না বুঝতে পারলে এই 'জগৎ' ও 'জীব'-কে পৃথক্ সত্য তত্ত্ব বলে বোধ হয় না। জীব ও জগৎকে মিথ্যাস্বরূপ কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র। মানব দেহ বিশিষ্ট জীব এই জড় দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাই 'বিবর্তের' স্থল। যে বস্তু যা নয়, তাকে সেই বস্তু মনে করার নাম 'বিবর্ত'। জীবের পক্ষে 'বিবর্ত' একটি মহা দোষ; বদ্ধজীব সেই বিবর্ত-দোষে দূষিত। এইরূপ 'বিবর্ত' দোষকে কৃষ্ণতত্ত্বে বা জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচলিত শক্তিকে ভুলে গেলে এই রকম ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান যেভাবে জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন, সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রাকৃত জগতে 'চিন্তামণি' বলে একটি রত্ন আছে। তা নানা রত্নরাশিকে প্রসব করেও স্বয়ং অবিকৃত স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃত

বস্তুতে যদি এই রকম অচিন্ত্য শক্তি থাকে, তা হলে ভগবানের যে তার থেকে অধিক গুণ-সম্পন্ন একটি অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে?

"বেদের মূল বাক্য 'প্রণব', সুতরাং তাই-ই একমাত্র ব্রহ্ম—মহাবাক্য। 'প্রণব'—ভগবানের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ। সুতরাং তা ভগবানের নাম, রূপ, ধাম, লীলা আদি সমন্বিত ভগবানকেই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু শঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসি', 'সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম' আদি যে সমস্ত বেদবাক্যের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যা বেদের সর্বদেশব্যাপী, তাই মহাবাক্য। সুতরাং 'প্রণব' ছাড়া আর কোনটিই 'মহাবাক্য' হতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করে শ্রীশঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসি'-কে মহাবাক্য বলেছেন। সেই কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন করে বেদের মুখ্য বৃত্তি ছেড়ে যে গৌণ বৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে বেদান্ত-সূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যাকে অকারণে তিরস্কার করা হয়েছে। স্বতঃপ্রমাণ বেদ হচ্ছে সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি, কিন্তু তাতে যদি কল্পিত অর্থ আরোপ করা হয়, তা হলে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতার হানি হয়।"

এই বলে মহাপ্রভু বললেন, "শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভগবানের আদেশ অনুসারে এইভাবে বেদান্ত-সূত্রের সহজার্থ ত্যাগ করে কল্পনাপূর্বক গৌণার্থ ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন। বেদান্ত-সূত্র ব্রহ্মবাক্য। ব্যাসাবতার ভগবান স্বয়ং এই বেদান্ত-সূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং বেদে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ থাকতে পারে না। বেদান্ত-সূত্রের অর্থ অতি সহজে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ভাষ্য বেদান্ত-সূত্রকে জটিল করেছে। ভাষ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল সূত্রকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু শঙ্করাচার্য সূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে কল্পিত অর্থের দ্বারা বেদকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাই এই ভাষ্য শ্রবণ করলে জীবের সর্বনাশ হয়। শঙ্করাচার্যের অবশ্য তাতে কোনও দোষ নেই। কেননা তিনি ভগবানের আদেশে তা করেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই মহাতেজস্বিতাপূর্ণ অপূর্ব বাণী শ্রবণ করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কাশীবাসী দশ সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসী বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। এ পর্যন্ত কেউই শঙ্কর-ভাষ্যের এই রকম শাস্ত্র-বিচারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে

দোষ দর্শন করতে সাহস করেন নি। কাশীধাম পণ্ডিতের স্থান—মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান। এই যে দশ সহস্র সন্ন্যাসী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তারা সকলেই মহা মহা পণ্ডিত। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীর পণ্ডিত এবং বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের একছত্র সম্রাট। মহাপ্রভু বিদেশী, তাঁর সঙ্গে মাত্র চারজন ভক্ত। তারা সকলেই মহাপ্রভুর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে হতবাক্ হলেন, তাঁর অপূর্ব সাহস দেখে ভীত হলেন। দশ সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একাকী নির্ভীক চিত্তে তাদের পরম গুরুর মত খণ্ডন করে তাদের সামনেই তার নিন্দা করলেন। তাতে ভক্তদের চিত্তে ভয় এবং বিস্ময়ের উদয় হল। সবচাইতে আশ্চর্য হলেন স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তিনি এখন বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য থেকেও অধিক প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী মহাপুরুষ। পূর্বে তাঁর নিন্দা করার জন্য তিনি মহা লজ্জিত হলেন এবং তার মনে আত্মগ্লানির উদয় হল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি মহাপ্রভুকে বললেন, "শ্রীপাদ! আপনি যে কথা বললেন তাতে আমাদের কোনও সংশয় নেই। আপনার ব্যাখ্যা যে মূল সূত্রের দ্বারা

অনুমোদিত এবং সরল তা বুঝতে পারছি। আর আমাদের আচার্যের ভাষ্য যে তাঁর মনোকল্পিত, তাও এখন আমরা বুঝতে পারছি। তবে সম্প্রদায়ের অনুরোধে তা আমাদের মানতে হবে। এখন আপনি বললেন বেদান্ত-সূত্রের একটি মুখ্য অর্থ আছে। এখন আপনি দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন, আমরা শুনে কৃতার্থ হই।"

মহাপ্রভু তখন বললেন, "বেদ ও পুরাণে ব্রহ্ম বলতে বৃহৎ বস্তু, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মকে নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। যে সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শ্রুতি শাস্ত্রই আবার অন্যত্র সাকার ব্রহ্মেরও রূপ বর্ণনা করেছে। অতএব শ্রুতির উভয় স্থল বিচার করে দেখলে সবিশেষ অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মের পক্ষে বহু প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানের ঐশ্বর্য তাঁর মতো চিদানন্দময়, তাতে মায়ার সম্বন্ধ নেই এবং তাঁর শক্তিও চিদ্‌রূপা। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের আকার, ঐশ্বর্য ও শক্তি স্বীকার করেন না। কেবল ব্রহ্মের সত্তা মাত্র স্বীকার করেন। এই মত দোষাবহ; ভগবানের চিদৈশ্বর্য, চিদাকার এবং চিৎশক্তি না মেনে কেবল সত্তামাত্র মানলে, তাঁর অর্ধস্বরূপ অস্বীকার করা হয়। তাতে

"সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭/১৪৯)

মহাপ্রভু কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এইভাবে বৈষ্ণবে পরিণত করলেন। হরিনাম মহামন্ত্র দিয়ে সকলকে উদ্ধার করলেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত কাশী নগরীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়পতাকা উড্ডীয়মান হল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা মহাপ্রভুকে দিব্যজ্ঞানসিন্ধু এবং রামানন্দ রায়কে জলধি বলে বর্ণনা করেছেন। রামানন্দ রায় ছিলেন ভজনতত্ত্ববিদ্, এবং মেঘ যেমন সাগর থেকে জল সংগ্রহ করে, তিনিও সেইরকম মহাপ্রভুর প্রসাদে সকল শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। সাগরের জল থেকে মেঘ সৃষ্টি হয়ে, সারা বিশ্বে বারিবর্ষণ করে সাগরে যেমন ফিরে যায়, ঠিক সেইরকম গৌরসুন্দরের কৃপায় রামানন্দ রায়ও উচ্চ ভগবদ্ভজন তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে, কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে আবার মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পুরীতে প্রত্যাবর্তনের মনঃস্থ করেন।

দক্ষিণ ভারতে পর্যটনের সময়, সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিয়ড়-নৃসিংহ-ক্ষেত্র নামে বিখ্যাত মন্দিরে যান। জিয়ড়-নৃসিংহ মন্দির দর্শনান্তে গৌরহরি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং অবশেষে গোদাবরীনদীর তীরে উপনীত হন। গোদাবরী তীরে ব্রজের যমুনা তাঁর স্মরণাকাশে উদিত হন; নদীতীরবর্তী বৃক্ষগুলি তাঁর কাছে

বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজী বলে প্রতিভাত হয়। এইভাবে তিনি ব্রজভাবে আবিষ্ট হন। গোদাবরীর পূত সলিলে স্নান সমাপন করে, নদীতীরে উপবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ঠিক সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু ব্রাহ্মণ ও পার্ষদ সমভিব্যাহারে রাজ্যপাল রামানন্দকে গোদাবরী তীরে উপনীত হতে দেখেন। পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহান্ ভগবদ্ভক্ত রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কবুরে সাক্ষাতের জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেন। নদীতীরে আগমনকারী ব্যক্তিটিই রামানন্দ রায় বুঝতে পেরে মহাপ্রভু অচিরেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্বয়ং একজন সন্ন্যাসী হওয়ায়, মহাপ্রভু একজন রাজনৈতিক নেতার কাছে যেতে আত্মসংবরণ করেন। মহান্ ভগবদ্ভক্ত রামানন্দ রায় সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শনের জন্য স্বয়ং উপনীত হন এবং সাষ্টাঙ্গে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। মহাপ্রভু মহামন্ত্র কীর্তন করেন—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এবং তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

রামানন্দ রায় তাঁর যথাযথ পরিচয় জ্ঞাপন করলে, মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং উভয়ে ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত হন। উভয়ের প্রেমালিঙ্গন ও ভাবাবিষ্টতা দর্শনে রামানন্দের পার্ষদ সহচর ব্রাহ্মণরা বিস্মিত হন। তারা সকলেই কট্টর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হওয়ায় এইরকম ভগবদ্ভক্তির লক্ষণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হন। বস্তুত একজন শূদ্রকে এইরকম মহান্ এক সন্ন্যাসীর আলিঙ্গম করতে দেখে তারা পক্ষান্তরে বিস্মিত হন এবং একজন রাজ্যপাল ও কার্যত রাজা, এই রামানন্দ রায়কে কেবল এক সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনেই ক্রন্দন করতে দেখে তারা হতবাক্ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণদের মনোভাব বুঝতে পারেন; এবং পরিস্থিতি অসঙ্গত বিবেচনা করে নিজ ভাব সংযত করেন এবং প্রশান্ত হন।

তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায় একত্রে উপবিষ্ট হন

ও মহাপ্রভু জানান যে, সার্বভৌম তাঁর উচ্চ প্রশংসা করায় তিনি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উত্তরে রামানন্দ রায় বলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে নিজ ভক্ত মনে করায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দান করেন।

একজন ধনী ব্যক্তিকে স্পর্শ করার জন্য রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর বন্দনা করেন। রাজা, রাজ্যপাল বা যে কোন রাজনৈতিক নেতাই সর্বদা অর্থ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আবিষ্ট চিত্ত থাকে। এইজন্য সন্ন্যাসীরা এই রকম ব্যক্তির সঙ্গ প্রতিনিয়তই পরিহার করে চলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে একজন মহান্ ভগবদ্ভক্ত বলে জানতেন এবং এইজন্য তিনি রামানন্দ রায়কে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর এই প্রেমালিঙ্গনে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/৮/৪) শ্লোকটি উল্লেখ করেন। তার অর্থ হচ্ছে, —"শুধু কৃপাশীর্বাদ দানের জন্যই মহান্ ব্যক্তি ও ঋষিরা বিষয়ীর গৃহে আগমন করেন।"

রামানন্দ রায়ের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এইরকম প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করেন যে, অব্রাহ্মণ বংশজ হলেও রামানন্দ

রায় পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ-সেবায় ছিলেন অত্যন্ত প্রবীন ও প্রগতিশীল। এইজন্যই রামানন্দ রায় ব্রাহ্মণ বংশজ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক সম্মানীয়। দীন ও পতিতের মতো ব্যবহার দ্বারা রামানন্দ নিজেকে শূদ্রাধম মনে করলেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে মহাভাগবত বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করেন না, কিন্তু ভগবান ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচারে খুবই উৎসাহী। সেই প্রাতঃকালে গোদাবরীর তীরে প্রথম মিলনের পর পুনরায় সন্ধ্যাবেলায় সাক্ষাৎকার মানসে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন।

সেইদিন সন্ধ্যায়, স্নানাবসানে উপবিষ্ট মহাপ্রভুকে একটি ভৃত্য সহ রামানন্দ রায় দর্শনে আগমন করেন এবং তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম জ্ঞাপন করে তাঁর সম্মুখে উপবেশন করেন। রামানন্দ রায় পরমার্থ তত্ত্বে উন্নতি প্রসঙ্গে গৌরসুন্দরকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্বেই মহাপ্রভু স্বয়ং রামানন্দ রায়কে 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব' বিষয়ে শাস্ত্র শ্লোক উল্লেখ করতে অনুরোধ করেন।

শ্রীরামানন্দ রায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন যে, নিষ্কপটভাবে স্বধর্ম পালনকারীর ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হবে। তিনি বিষ্ণু পুরাণ থেকে একটি শ্লোক (৩/৮/৯) উল্লেখ করেন। সেখানে বলা

হয়েছে, স্বধর্ম পালন দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপাস্য এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার অন্য বিকল্প নেই। তাৎপর্য এই যে, এই দুর্লভ মানব জীবন হচ্ছে ভগবৎ সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্য এবং স্বধর্ম পালন দ্বারা সেইভাবে কার্য করে ভগবৎ সেবায় নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে মানব সমাজকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রতি শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম-বিধি ও কর্মবৃত্তি আছে। সভ্য ও সুসংগঠিত মানব সমাজে বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের ঐ নির্দিষ্ট নিয়মবিধিগুলি অবশ্য পালনীয়। সেই সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতির জন্য চারিটি আশ্রমও অবশ্য পালনীয়। যেমন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

রামানন্দ রায় বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মের এই আটটি নিয়মবিধি কঠোর ভাবে যারা পালন করে তারাই বস্তুত পরমেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করতে পারেন; যারা তা করে না, নিঃসন্দেহে তারা দুর্লভ মানব জীবনের অপব্যয় করে নিরয়গামী হয়। এইভাবে শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের মাধ্যমে একজন শান্তিপূর্ণভাবে মানব জীবনের লক্ষ্য সাধন করতে পারে। জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষা অনুযায়ী নিয়মবিধি পালন

দ্বারা এক বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রের বিকাশ হয়। সমাজ বিভাগ এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও পারমার্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যাতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে সেই নিয়মাধীনে আনা যায়। সমাজশ্রেণীকে আরও নিম্নলিখিতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা যায়—(১) আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করাই যার জীবনব্রত এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে যিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাকে ব্রাহ্মণ বলে; (২) যিনি সরকারী শাসনকার্যে ও বলবীর্য প্রদর্শনে আসক্ত তাকে ক্ষত্রিয় বলে; (৩) যিনি কৃষিকার্য, গো-পালন, ব্যবসাকার্যে নিয়োজিত তাকে বৈশ্য বলে; (৪) অন্যান্য তিন শ্রেণীর লোকের সেবা ছাড়া যার কোন বিশেষ জ্ঞান নেই তাকে শূদ্র বলে। যিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয় সিদ্ধিপথে অগ্রসর হবেন। এইভাবে বিধিবদ্ধ জীবন সকলের পক্ষে সিদ্ধিলাভের আধার। যখন ভগবান শ্রীহরির প্রীতিময় ভজন এই বিধিবদ্ধ জীবনের পরাকাষ্ঠা হয়, তখন সেই হরিভজনকারী জীবনের অন্তিম সিদ্ধি লাভ করেন। নয়তো, এইসব নিয়ম বিধি পালন শুধু কালক্ষয় ছাড়া কিছুই নয়।

রামানন্দ রায়ের কাছে বর্ণাশ্রম জীবন যাপনের যথাযথ ব্যাখ্যা শুনে মহাপ্রভু বলেন যে, এই বর্ণাশ্রমবিধি শুধু বাহ্য। পরোক্ষভাবে গৌরসুন্দর রামানন্দ রায়কে বাহ্য বর্ণাশ্রমবিধি অপেক্ষা শ্রেয় কিছু ব্যাখ্যা করতে বলেন। ভগবৎ-সেবার সিদ্ধিতে পরাকাষ্ঠা না হলে কেবল লৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান ও ধর্ম পালন সবই নিষ্ফল। ভগবান বিষ্ণু শুধু বৈদিক বিধি অনুযায়ী ক্রিয়াকর্মে সন্তোষ লাভ করেন না; কৃষ্ণভাবনাময় স্তরে উন্নীত হলেই বস্তুত ভগবান তুষ্ট হন।

রামানন্দ রায়ের শ্লোক অনুসারে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হরিভক্তি স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। জগদুদ্ধারে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেন যে,. বর্ণাশ্রম ধর্মাচরণ দ্বারা পরম আধার ভগবান মুকুন্দের উপাসনার মাধ্যমে মানব জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে রামানন্দ রায়ের বর্ণনা গৌরসুন্দর অস্বীকার করেন, কেননা মহাপ্রভু কর্মমীমাংসক নামে তত্ত্ববাদীদের স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। কর্মমীমাংসকরা ভগবানকে কর্মের অধীন হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পুণ্য কর্মের সুফল প্রদানে ভগবান বাধ্য। এইভাবে বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু পরম স্বতন্ত্র নন; কর্মীকে তার কর্ম অনুসারে যথাযথ ফল প্রদানে তিনি বাধ্য। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে অব্যক্ত, নির্বিশেষ ও ব্যক্ত সবিশেষ, ইচ্ছামত উভয়ই ভাবুন না, এই রকম এক পরতন্ত্র লক্ষ্য উপাসকের নিয়ন্ত্রাধীন হয়ে পড়ে। বস্তুত এই তত্ত্ব-অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব বস্তুর অব্যক্ত, নির্বিশেষ রূপের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই রকম অব্যক্তবাদ মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি তা অস্বীকার করেন।

অবশেষে মহাপ্রভু বলেন, "অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা শ্রেয় কিছু অবগত হলে, তা আপনি আমাকে বলুন।" রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেন, বরং কর্মফলাকাঙ্ক্ষীর ফল ত্যাগ করা শ্রেয় বলে, ভগবদ্গীতা থেকে নীচের শ্লোকটি উল্লেখ করেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

অর্থাৎ, "হে কৌন্তেয়, তুমি যে সকল কার্য কর, যা আহার কর, যা অর্পণ কর, যা দান কর এবং তোমা কৃত সকল তপশ্চর্যা সমুদয়

আমাকে অর্ঘরূপে নিবেদন কর” (ভগবদ্‌গীতা ৯/২৭)। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৬) এই রকম একটি বর্ণনা দেখা যায়; সেখানে উল্লিখিত আছে যে, সকল কর্মফল, কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা ও গুণময়ী প্রকৃতি—সমুদয়, আদি পুরুষ নারায়ণের চরণ কমলে সমর্পণ করা উচিত।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য করেন; গৌরসুন্দর বলেন, “এটির চেয়ে শ্রেয় কোন প্রস্তাব অবগত হলে, তাই বলুন।”

নির্বিশেষ ভাবাসক্ত হয়ে ভগবানকে আমাদের কর্ম-পরতন্ত্র বিবেচনা করা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্‌গীতার নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করা শ্রেয়; কিন্তু এটি ভগবচ্চরণে সমুদয় কর্মার্পণ অপেক্ষা ন্যূন। উপযুক্ত গুরুদেবের কৃপা ছাড়া কর্মীর ভব-সম্বন্ধের পরিবর্তন অসম্ভব। এইরকম সকাম কর্ম একজনকে সংসারোন্মুখ করে। শুধু ভগবানে কর্মফল অর্পণের উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভববন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কিছুই বলা হয় নি; এইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রস্তাবটিও অস্বীকার করেন।

তাঁর প্রদত্ত দুটি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হওয়ায় রামানন্দ রায় বলেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুগ সকল কর্ম ত্যাগ করা উচিত এবং নিরাসক্ত ব্রহ্মান্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই। পক্ষান্তরে তিনি সংসার জীবন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগের সুপারিশ করেন এবং এই মতামতের সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৩২) একটি শ্লোক উল্লেখ করেন, যার তাৎপর্য হচ্ছে—শাস্ত্রে কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াকর্মের এবং ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা আমি প্রকাশ করেছি। “সেটিই ধর্মের সর্বোচ্চ পরম সিদ্ধি।” রামানন্দ রায় ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশও উল্লেখ করেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অর্থাৎ, “সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল আমার চরণে শরণাগত হও; আমি তোমাকে সকল পাপের কল থেকে উদ্ধার করব, সুতরাং উদ্বিগ্ন হইও না (গীঃ ১৮/৬৬)।”

মহাপ্রভু এই তৃতীয় প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য করেন, কেননা তিনি প্রদর্শন করতে চান যে শুধু ত্যাগই যথেষ্ট নয়, ভগবৎ প্রীতিময় কর্ম করা চাই। এই ভগবৎ প্রীতিময় কর্ম বা সেবা ছাড়া সর্বোচ্চ সিদ্ধি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। সাধারণত সন্ন্যাস আশ্রমে দুই রকম

তত্ত্ববাদী থাকেন; তাদের একজনের লক্ষ্য নির্বাণ, অপরজনের লক্ষ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি। নির্বাণ ও ব্রহ্মজ্যোতির অতীত, পরব্যোমে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি, এই সব তত্ত্ববাদীদের কল্পনারও অতীত। ভবসংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণে চিন্ময় কর্ম বা ব্রহ্মকর্ম এবং চিন্ময় লোক সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই তৃতীয় প্রস্তাবটিও অস্বীকার করেন।

রামানন্দ রায় তখন ভগবদ্‌গীতা থেকে আরও প্রতিপাদন করে এই শ্লোকটি উল্লেখ করেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥

অর্থাৎ, যিনি দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি অচিরেই ব্রহ্মোপলব্ধি করেন; তিনি কখনও শোকে অভিভূত হন না; তিনি কিছুই কামনা করেন না, তিনি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হন। এই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করেন (ভগবদ্‌গীতা ১৮/৫৪)।" প্রথমে রামানন্দ রায় কর্মফল ত্যাগ করে ভগবৎ-সেবার সুপারিশ করেন, কিন্তু এখানে পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মোপলব্ধি যুক্ত যে ভগবৎ-সেবার সুপারিশ করা হল, তা শ্রেয়।

যাইহোক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ ব্রহ্মোপলব্ধিতে বিষয় বৈরাগ্য দ্বারা কেউই বৈকুণ্ঠ লোক ও বৈকুণ্ঠ কর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। ব্রহ্ম উপলব্ধিতে নিষ্কলুষ হলেও সেটিই পরম সিদ্ধি নয়; কারণ ঐ স্তরে ভগবৎ-প্রীতিময় কোন ব্রহ্মকর্ম নেই। কেননা এটি বাহ্য, এটি মনোধর্ম। এই ব্রহ্মকর্মে বৈকুণ্ঠ সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত না হলে শুদ্ধ জীবাত্মার ভবন্ধন মোচন হয় না। নির্বিশেষ ও শূন্যবাদে আবিষ্টতা যতদিন থাকবে, সে পর্যন্ত শাশ্বত আনন্দ চিন্ময়ঘন রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না। ব্রহ্মোপলবিধ পূর্ণ না হলে, মন থেকে সকল জড় বৈচিত্র্য মুক্ত করার প্রয়াস ব্যাহত হবে। এই জন্য কৃত্রিম ধ্যান মার্গে মনকে শূন্য করার নির্বিশেষবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। মনকে জড়বুদ্ধি নির্মুক্ত করা দুঃসাধ্য। এইজন্য ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

অর্থাৎ, "পরমেশ্বরের নির্বিশেষ অব্যক্ত মূর্তি উপাসনায় আসক্তচিত্তদের পারমার্থিক উন্নতি অতীব দুরূহ; বস্তুত এই মার্গে

প্রগতি সর্বদাই ক্লেশকর। (ভগবদ্‌গীতা ১২/৫)" এই রকম ভগবানের নির্বিশেষ অব্যক্ত মূর্তির ধ্যানে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ হওয়ায়, চৈতন্য মহাপ্রভু এটিও অস্বীকার করেন।

এই চতুর্থ প্রস্তাবটিও অস্বীকৃত হওয়ায়, রামানন্দ রায় বলেন যে, মনোধর্মী নিরস তর্ক বা জ্ঞানানুশীলনের প্রয়াস ছাড়া শুদ্ধ বিমল কৃষ্ণ ভজনই পরম সিদ্ধি। এই প্রস্তাবের সমর্থনে রামানন্দ রায় শ্রীমদ্ভাগবত থেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার একটি স্তব উল্লেখ করেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

অর্থাৎ, "হে প্রিয় প্রভু, নির্বিশেষাত্মক অভেদবাদ ও মনোধর্মী জ্ঞানানুশীলন সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে, তত্ত্বদর্শী ভাগবতের কাছে অপ্রাকৃত ভগবানের বাণী শ্রবণের মাধ্যমে, চিন্ময় হরি সেবাময় জীবনের সূচনা করা কর্তব্য। এইভাবে 'বৈধীভক্তির' মাধ্যমে শুদ্ধ ও চিন্ময় জীবনযাপন অনুশীলন করলে, আপনি

অজিত হওয়া সত্ত্বেও, ঐ পন্থায় আপনি ভক্তের দ্বারা বিজিত হন।"

রামানন্দ রায়ের এই প্রস্তাব শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু বলেন, "হ্যাঁ, এটিই গ্রহণীয়, এটিই ঠিক।" এই যুগে জ্ঞানমার্গ, কর্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কেননা অধিকাংশ লোকই পতিত ও অধম, ক্রমান্বয় পন্থায় পারমার্থিক উন্নতিও সময় সাপেক্ষ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে যে স্থানে অবস্থান করুক না, সকলেরই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অপ্রাকৃত লীলাবিলাস কাহিনী শ্রবণে নিরত হওয়া উচিত। শুদ্ধ হরিভক্তের কাছে এই দিব্য বৈকুণ্ঠ বাণী আস্বাদন করা চাই। এইভাবে যে কোন অবস্থায় অবস্থিত মানুষই পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবেন। এইভাবে তার পারমার্থিক প্রগতি অবশ্যম্ভাবী ও সম্যক্ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হবে।

এই বিধি স্বীকার করলে গৌরসুন্দর ভগবদ্ভজনে উন্নতির জন্য রামানন্দ রায়কে এটি আরও ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে

ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতি আলোচনার একটি সুযোগ প্রদান করেন। প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের বর্ণাশ্রম ধর্ম ও কর্মার্পণ প্রস্তাব অস্বীকার করেন; কেননা শুদ্ধ বিমল হরিভক্তি সাধনে ঐসব বিধির কোন স্থানই নেই। আত্মোপলব্ধিহীন কৃত্রিম ভগবৎ-সেবা পন্থা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপে কখনই স্বীকৃত নয়। আত্মোপলব্ধি-পূর্ণ শুদ্ধ হরিভজন সব রকম দিব্য কর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সর্বোচ্চ ব্রহ্মকর্ম, সব রকম জ্ঞান, কর্ম ও জড় অভিলাষ নির্মুক্ত। সর্বোত্তম ব্রহ্মকর্ম হচ্ছে সরল, অনুকূল, শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় কেন্দ্রীভূত।

রামানন্দ রায় গৌরসুন্দরের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। তাই তিনি বলেন যে বিমল ভগবৎ-প্রেম লাভই পরম সিদ্ধি। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ রায় কৃত পদ্যাবলীতে একটি অতি সুন্দর শ্লোক আছে; শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে যে, "যতক্ষণ জঠরে ক্ষুধা আছে, আহার ও তৃষ্ণা অনুভব হবে, এবং আহার্য গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ হবে। সেই রকম বহু ভগবদুপাসনার উপচার থাকলে, কেবল ভগবৎ-প্রেম মিশ্রিত হলে, তা দিব্য আনন্দ লাভের যথার্থ উৎস হবে।" রামানন্দ রায় আর একটি শ্লোক রচনা করেন যার

তাৎপর্য হচ্ছে, কোটি কোটি জন্মেও হরিভক্তি লাভ হয় না, কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলাষী হলে, বিশুদ্ধ হরিভক্ত-সান্নিধ্যে তা সম্ভব হয়। এইজন্য মুকুন্দ ভজনে বলবতী ইচ্ছার একান্ত প্রয়োজন। এই দুটি শ্লোকে রামানন্দ রায় বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির উল্লেখ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দের কাছে রাগানুগা ভক্তির স্তর আনয়ন করতে চান্ এবং সেই রাগানুগা ভক্তি স্তরে আলোচনা করতে ইচ্ছুক হন। এইভাবে রামানন্দ রায় ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনা ভগবৎ-প্রেম আধারিত পথে অগ্রসর হয়।

ভগবৎ-প্রেম ব্যক্তিগত স্তরে উন্নীত হলে তাকে প্রেমভক্তি বলে। এই প্রেমভক্তির সূচনায় ভগবান ও ভক্তে কোন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, কিন্তু প্রেমভক্তির পরিণত বা ঘনীভূত অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে বিভিন্ন দিব্য রস ব্যক্ত হয়। তার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দাস্যভাব; এই রসে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রভু ও ভক্ত তাঁর নিত্য দাস রূপে স্বীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থা গ্রহণ করলে, রামানন্দ রায় এটিকে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ বা দাস্য রস রূপে বর্ণনা করেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৫/১৬) মহাযোগী দুর্বাসা

মুনি নিজেকে পরমার্থ সাধনায় বহুমানন করে, তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্ত মহারাজ অম্বরীষ-এর প্রতি ঈর্ষা ভাবাপন্ন হন। মহারাজ অম্বরীষকে লাঞ্ছিত করবার প্রয়াসী হলে দুর্বাসা মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন ও ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র দ্বারা পরাভূত হন। দুর্বাসা মুনি নিজ ত্রুটি স্বীকার করেন ও ভগবানের গুণগান করে বলেন, "যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণেই জীবকুলের ভববন্ধন মোচন হয়, সেই ভগবান শ্রীহরির ভজনরত শুদ্ধ বিমল ভগবদ্ভক্তগণের কাছে দুর্লভ কি আছে?"

স্তোত্র রত্নে (৪/৬) যামুনাচার্য্য লিখেছেন, "হে প্রভু, তোমার সেবাহীন স্বাধীন ব্যক্তিরা সকলেই অসহায়, অনাথ। স্বতন্ত্রভাবে কাজ করায় তারা কর্তৃপক্ষের সহায়তা লাভ করে না, কৃপা প্রাপ্ত হয় না। তাই আমি প্রার্থনা করি, হে প্রভু! সকল জড় সন্তোষ, অভিলাষ ও মনোধর্মাসক্তিহীনভাবে আমি কবে আপনার প্রেমময় দিব্য অপ্রাকৃত সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হব। এই রকম অনন্য ভগবদ্ভজনে ব্রতী হলেই আমি যথার্থ চিন্ময় জীবনানন্দ উপভোগ করব।"

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ৬৪ টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা

প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণ করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অব দানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্য সহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে

প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সকলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিদোন্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে

বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীতে ১৫ টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শ'।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চৌদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।